১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স

শক্ত আহারের

দুটি টিনের সঙ্গে!

নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু
নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্যে উপকারী।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

নির্বাচিত কয়েকটি শহরে, বিশেষ উপহারের টিনের ওপর
স্টক থাকা পর্য্যন্তই এসুযোগ পাওয়া যাবে।

CLARION/B/GX/5/244 BEN

আনন্দমেলা

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৯১ □ ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা

ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
উপন্যাস
মড়ার উপর খাঁড়া (শেষাংশ) । নবকুমার বসু ৩৩
গল্প
সেয়ানা ঘোড়া । শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৯
ভাইফোঁটা । শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩
বাবার অদ্ভুত ছাতা । দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
ইতিহাসের গল্প
ছত্রপতির বংশধর । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪৬
শার্লক হোমসের গল্পমালা
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫৪
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫১
বাইরে, দূরে
প্রতিযোগিতায় প্রথম গুলি । সোমা দত্ত ৫২
ছড়া ও কবিতা
কাছিম বুড়ো । অসিত ভট্টাচার্য ১৯
তিনটি সাপের ছানা । প্রণব মুখোপাধ্যায় ২৪
দুই নভশ্চর । রঞ্জন ভাদুড়ী ৫৮
লেখাপড়া, চেনাজানা
অর্থ জানো । দেব সেনাপতি ৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫
ঘরের শব্দ । অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১১
উল্টাডাঙা গবর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস ৫৯
খেলাধুলো
প্রথম খেলা নিরুত্তেজ । রাজা গুপ্ত ৬৩
এক ডজন ডুরাণ্ড । নৃপতি চৌধুরী ৬৪
বিধ্বংসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ । অশোক রায় ৬৫
হাজার টেস্টের মেলায় । সম্রাট রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী, কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ৩০, টারজান ৩২, সদাশিব ৪৮
গাবলু ৬১, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬২
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ২২ ; মজার খেলা, হাসিখুশি ২৩
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

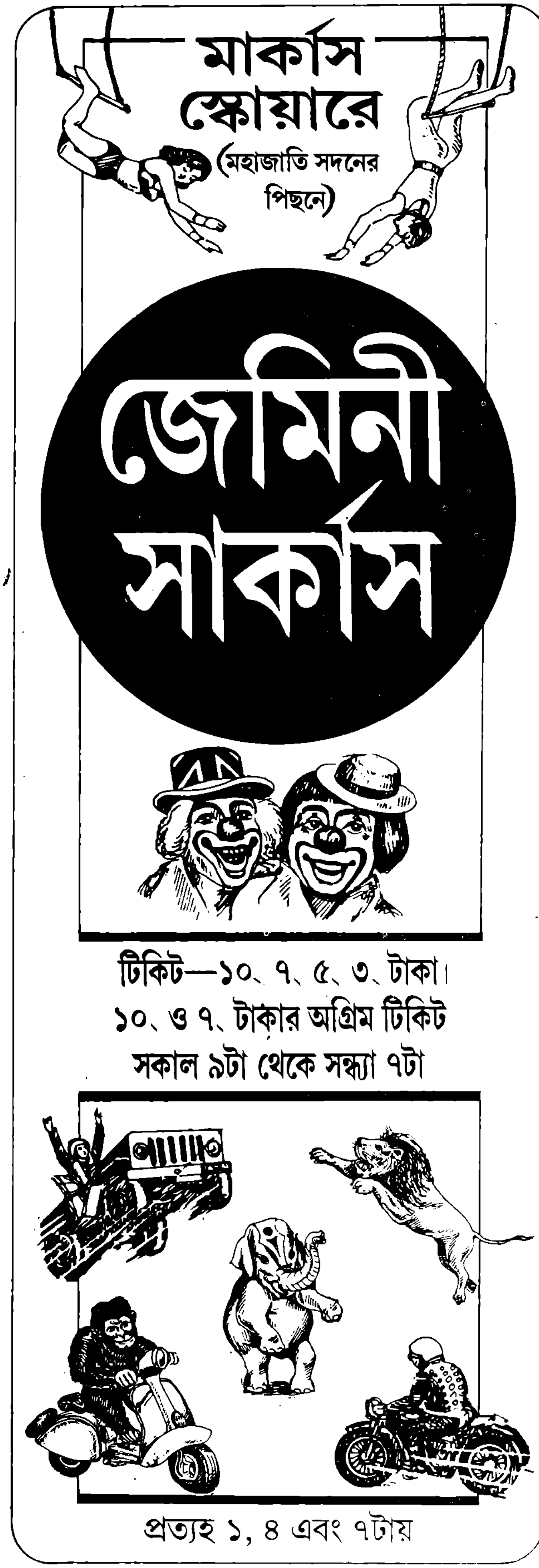

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

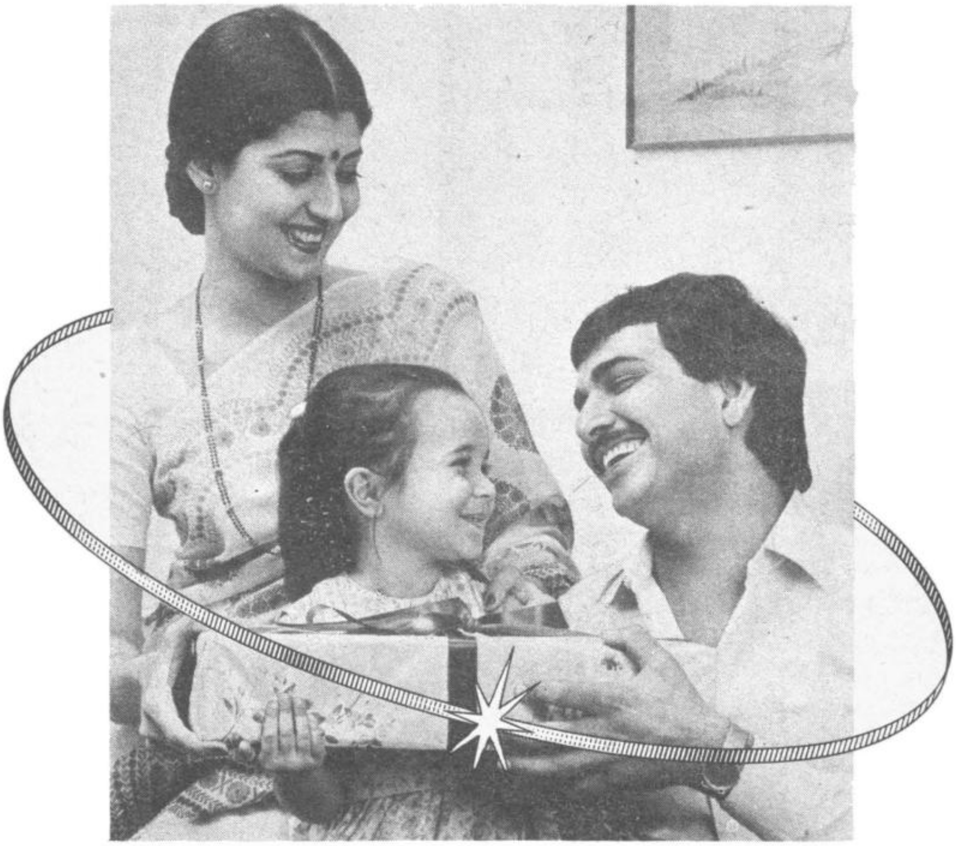

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

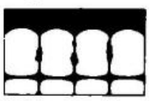

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

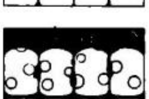

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবানু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়! আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

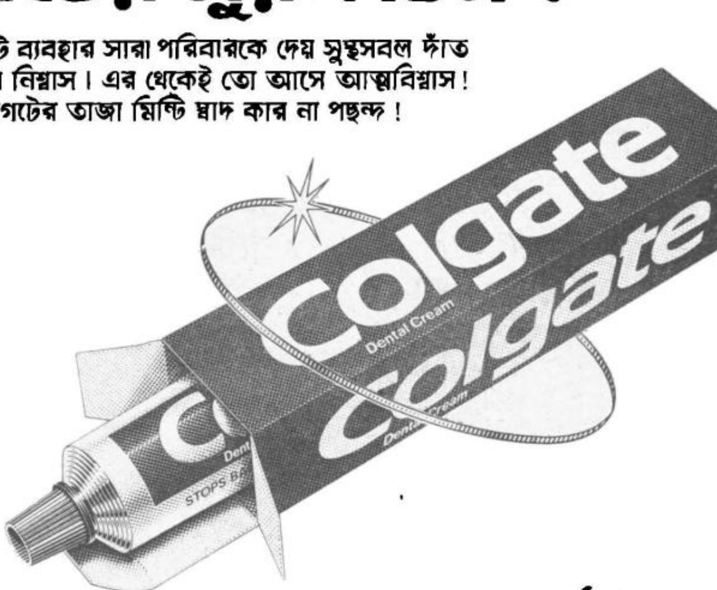

GK&E.BR4.55 Ben

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ!

অর্থ জানো

উঞ্ছবৃত্তি, বিজিগীষা...

শব্দের অর্থের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। তাতে মোটামুটি আমাদের কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু ভুল করার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। তাই বাংলাভাষার প্রতিটি শব্দের অর্থ আমাদের জানা উচিত। অর্থ না জেনে আন্দাজে ব্যবহার করা বুদ্ধির কাজ নয়। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

১। **উঞ্ছবৃত্তি**—(ক) নীচ কাজ, (খ) দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে সাহায্য চাওয়া, (গ) খেতে পড়ে থাকা ধান খুঁটে নেওয়া, (ঘ) ভিক্ষা করা।

২। **বিজিগীষা**—(ক) হিংসা, (খ) আক্রমণের বাসনা, (গ) হত্যা করার মতলব, (ঘ) জয় করবার ইচ্ছা।

৩। **মাধুকরী**—(ক) স্ত্রী-মধুকর অর্থাৎ স্ত্রী-মৌমাছি, (খ) বাণিজ্যতরীর নাম, (গ) নানা গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ, (ঘ) মধু তৈরি করা।

৪। **অনামিকা**— (ক) কড়ে আঙুল, (খ) কড়ে আঙুলের পাশের আঙুল, (গ) কোনো মেয়ের নাম, (ঘ) ছদ্মনাম।

উত্তর

১। **উঞ্ছবৃত্তি**—(গ) খেতে পড়ে থাকা ধান খুঁটে নেওয়া। হেয় জীবনোপায় অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা—সে এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে খাবার উঞ্ছবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসা করছে।

২। **বিজিগীষা**—(ঘ) জয় করবার ইচ্ছা। মূলে আছে জি ধাতু, তার অর্থ জয়। এর বিশেষণে রূপ হয় বিজিগীষু। যথা—বিজিগীষু রাষ্ট্র।

৩। **মাধুকরী**—(গ) নানা গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ। মধুকর বা মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। যেমন—বৈরাগীর বৃত্তি মাধুকরী।

৪। **অনামিকা**—(খ) কড়ে আঙুলের পাশের আঙুল। যেমন—তার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা হিরের আংটি।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

বাবার বন্ধু নিহাল

চম্বল খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। বাবা চোখ বুঁজে চুপ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন।

Suddenly Chambal looked up from his newspaper and asked, "Have you ever been to Punjab, Daddy ?"

Mr Roy didn't answer for a while, and then spoke.

"Punjab ? Yes. But that was a long time ago. It used to be called 'the Punjab' then, and it hadn't been partitioned yet. My father, that is your grandfather, took us on a tour of north India."

"Did you meet many Sikhs there ?"

"We did. And we took to them almost at once."

"What did you particularly like about them, Daddy ?"

"I liked their friendly, open nature. Ours was not a long visit. We didn't see many places. Amritsar, Lahore, Wazirabad, Sialkot, and then we went on to Kashmir. But everywhere we went we met with the same warmth and friendliness. At Sialkot, I remember, we stayed with a Sikh family. A friend of his, a Mr Gurdayal Singh, invited us to stay in his house, and my father welcomed the invitation. In the couple of days we lived with them.Mr Singh's family and ours became very good friends. I particularly remember his son Nihal. I discovered that his habits and tastes were the same as mine. We became inseparable."

"But our way of life, our daily habits, our food are so different from theirs. Didn't that matter to you ?"

"Not to me, I can assure you. Not in the least. In fact, I got to like their ways. I should rather say that I didn't think in terms of 'we' and 'they'. Or, if I did think in those terms at all, Nihal and I were "we", and the elders of both our families 'they'. Friendship grows very quickly among the young. That has been my experience, and it must be yours, too."

চম্বল চুপ করে শুনছিল। শুনছিল আর ভাবছিল। কোথায় সেই শিয়ালকোট, কোথায় বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু নিহাল।

"When did you lose touch with your friend, Daddy ?" he asked.

"Not long after we left. I wasn't very good at writing letters. Neither was he. I wonder what he is doing now."

এবারে লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে এই শব্দগুলোর ব্যবহার।

Ours, theirs, mine, yours and his.
(note that there is no apostrophe before 's')
Ours was not a long visit.
Mr Singh's family and ours became very good friends.
His habits were the same as mine.
A friend of his, Mr Singh, invited us.
Our food is different from theirs.
That was my experience and it must be yours, too.

প্রসাদ

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই সবচেয়ে ভাল...

বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্য্যাস। যা সব সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।

বোরো ক্যালেনডুলা*

অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY CALCUTTA - 12

anjan chakraborty, Cal-74

ঘরের শব্দ

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

আমাদের মাতৃভাষার আকর মণিজালে পূর্ণ। এ আবিষ্কার মাইকেল মধুসূদন দত্তের। ধূলিমলিন রত্নগুলি চিনে ঝেড়েপুঁছে সাহিত্যের অঙ্গন সাজিয়ে তোলার কাজ সম্পন্ন করছেন অনেক বড় বড় সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, এ জন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। খাঁদা শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল। লক্ষণীয় শব্দটি ঢেঁকি। 'সে কী আঁকাবাঁকা ডামাডোল'—এখানে ডামাডোল শব্দটি প্রয়োগ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন প্রসঙ্গে 'হুটোপাটি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। খাঁদা, ঢেঁকি, ডামাডোল, হুটোপাটি প্রভৃতি রত্নসদৃশ শব্দ বাংলার আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে গৃহীত। অনার্যভাষার এ-সব শব্দকে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্তে দেশী শব্দ নামে উল্লেখ করা হয়। দেশী শব্দ রচনাকে জোরদার করে এবং লেখকরা সুযোগ পেলেই তা নিজেদের লেখায় ব্যবহার করেন।

"...তখন পুষ্পবতী কারো হাতে একছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।"—অবনীন্দ্রনাথ। "নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল।"—তারাশঙ্কর। "হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল।"—সৈয়দ মুজতবা আলী। "ক্যাবলা গোঁজ হয়ে রইল, আমি গোঁ-গোঁ করতে লাগলুম।"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। "কানে সোনালি রঙের মাকড়ি।"—লীলা মজুমদার। "রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন, কেন, কেন মা?"—শরৎচন্দ্র। "চিল একা নদীটির পাশে, জারুল গাছের ডালে বসে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে;"—জীবনানন্দ। "আকাশের চাঁদ হল কাস্তে।"—দিনেশ দাস। বিভিন্ন লেখকের এলোমেলোভাবে হঠাৎ-বাছাই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ব্যবহৃত চিক, মল, ট্যাঁক, ডাঁই, গোঁ-গোঁ, মাকড়ি, থতমত, জারুল, ডাল, কাস্তে প্রভৃতি শব্দ দেশী শব্দের অন্তর্গত।

দেশী শব্দগুলির মধ্যে অনেক পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির নাম আমরা পাই। যথা: বাবুই, হুতোম, হেলে, নেংটি, খেঁকশিয়াল, হাঁড়িচাচা, ডেয়ো ইত্যাদি। ঘরগেরস্তালির প্রয়োজনীয় কিছু গ্রাম্য জিনিসপত্রের নাম। যেমন: ঢেঁকি, ঝাঁটা, পাতিল, খালুই, চাড়ি, চিমটা, দরমা, বাখারি, বাতা, বিচালি, শপ, সেঁউতি, শেজ প্রভৃতি। খাদ্যদ্রব্য, ফল ও শাক-সবজির মধ্যে পাই আটা, আমানি, মালপো, লেংচা, ছক্কা, জলপাই, টেপারি, ফোঁপর, বাতাসা, বালাম, নটে, ইঁচড়, ধুন্দুল, উচ্ছে, কদু, গিমা, থানকুনি, থোড়, নালিতা ইত্যাদি। এছাড়া ধনিচা, হোগলা, জারুল, নিসিন্দা, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ-গাছড়া দেশী শব্দের নিদর্শন। মৎস্যপ্রিয় বাঙালি জাতির কাছে চেলা, টেংরা, লেঠা, রিঠা, পারশে, পোনা, বাটা প্রভৃতি নাম কত না মধুর! এ-সব নামের ঠাঁই দেশী শব্দের তালিকায়।

দেশী শব্দের বিশেষত্ব এগুলি অতি প্রাচীন কালের।

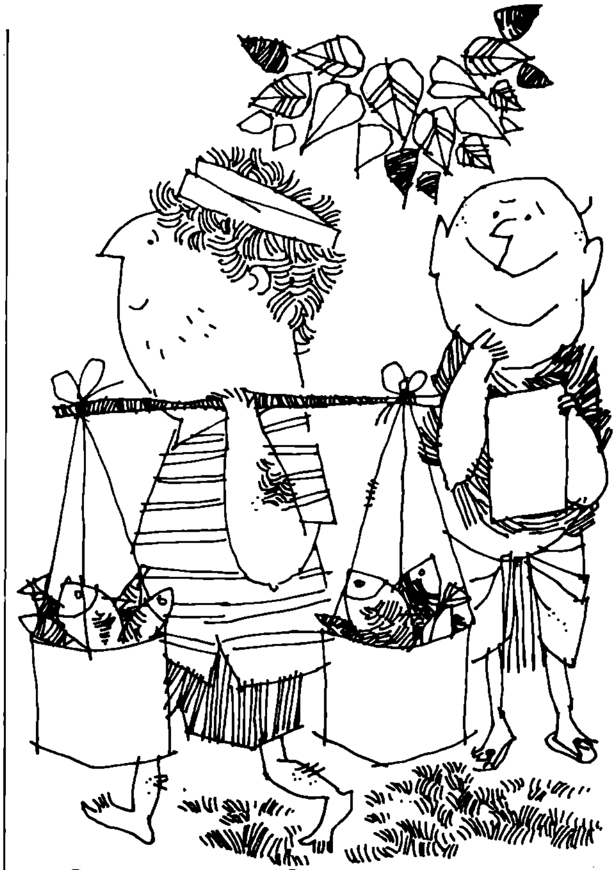

ইংরেজিতে বলা যায় শব্দগুলি as old as the hills· এ-সবই অনার্যভাষার সম্পদ থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত। বাংলাদেশে যে-সব অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, তারাই বাংলার আদিম অধিবাসী অনার্যদের বংশধর। এদেশের কিছু-কিছু স্থানের নামে তখনকার প্রচলিত নামগুলি রয়ে গেছে।

অলংকারের মধ্যে মাকড়ি, চিক, মল, নথ প্রভৃতি দেশী শব্দ। সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে টোড়ি, ডুগি, টিকারা প্রভৃতি। সড়কি, কোপ দেশী শব্দের অন্তর্গত। দিব্যেন্দু যে খেলা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, সে খেলার নাম দাবা। 'দাবা' দেশী শব্দ। দপদপ, দমাদম, ধড়মড়, ধরধর, দাউদাউ, ড্যাংড্যাং, ডিমিডিমি, আগাপাস্তলা, আজেবাজে, ভেলকি, উড়নচণ্ডে, উশখুশ, কড়কড়, কটাস, কাচুমাচু, খলখল খনখন, থুড়থুড়ে, থিকথিক, খাঁখাঁ, খিটমিট, গটমট, চটচট, ঘুসঘুসে, বানচাল ইত্যাদি দেশী শব্দে আমাদের মাতৃভাষা টইটুম্বুর। টইটুম্বুর দেশী শব্দ। ঘুটঘুটে, চনমন, চপচপ, চিঁহিহি, চিড়বিড়, ছিপছিপে, ঝিকিমিকি, টগবগ, টিমটিম, ডিমিডিমি, তড়বড়, তরতর, দুরুদুরু, ধুপধাপ—এসব শব্দরত্ন বাদ দিয়ে বাংলাভাষার কথা কি ভাবা যায়?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শব্দ-সংগ্রহ'-এ অনেক অনেক দেশী শব্দ আছে। যথা: অঢেল, আটি, আছাড়, আটক, আটা, আড্ডা, কটাস, কড়কড়, কুলঙ্গি, কিল, খাটাল, খালুই, গুমট, চনচন, চাটাই, ছোকরা, ছারপোকা, জুজু, ঝাঁটা, ঝিনুক, টপাটপ, ডালনা, ডিগবাজি, ডোবা, ডিঙা, ঢলঢল, ধড়ফড়, বিচালি, মাঠ, মটকা, ডোবা, নচ্ছার, ঠাট্টা, নিছক, ফচকেমি, ভেড়ি, ঠাসা, কচি।

ছবি : দেবাশিস দেব

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

নতুন

পণ্ডস্

কোল্ড ক্রীম সাবান

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

সেয়ানা ঘোড়া

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ইসকুল থেকে ফিরে কী মনে হল, কলি বেল টিপল না। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে দরজা খুলে গেল।

বাড়িতে কেউ নেই ? উঁকি মেরে দেখে, খাবার টেবিলের পাশে রতনের কাঁথাটা উলটুল, রতন নেই। একটু দূরে, বারান্দায়, রোদের ওপর পা দুটি মেলে দিয়ে ঠাক্‌মা বই পড়ছেন। থলথলে মুখের আদল দেখা যাচ্ছে, আর নাকের ওপর চশমা। চুপি-চুপি গিয়ে কলি ঠাক্‌মার কনুইয়ের নীচে একটা শ্যামচিমটি কেটে দিল। যাতে বেশি ব্যথা না লাগে।

ঠাক্‌মা ভাবেন, পোকামাকড় বুঝি। কনুই দিয়ে ঝট্‌কা মারতেই খিলখিল করে হেসে ওঠে কলি।

"এটা হল সেন্‌স অব টাচ।" কলি বলল।

এই সময়ে বাড়িতে আর কেউ থাকে না। বাবার আপিস। মায়ের কলেজ। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত, কলির ক্লাস নাইন হল, ওর যত আদর-আবদার ঠাক্‌মার ওপর।

ফিতে খুলে জুতোজোড়া ছুড়ে দিল ঘরের এক কোণে। কুণ্ডলি পাকানো মোজা দুটো সাদা বেরালছানার মতো ছিটকে গেল টেবিলের নীচে। বইখাতার বস্তা পিঠ থেকে লাফিয়ে ধুপ করে পড়ল বিছানায়।

ফিরে এসে কলি পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল ঠাক্‌মার। "কী বই পড়ছ গো ? দেখি, দেখি। ওমা গ্রাহাম গ্রিন !"

বলতে গিয়ে হঠাৎ দেখল ঠাক্‌মার কানের খুব কাছে এসে গেছে ওর মুখটা। তখন লোভ সামলাতে না পেরে দিয়ে দিল একটা মালগাড়ির কু যাতে বেশি চমকে না ওঠেন ঠাক্‌মা।

"এটা হল সেন্‌স অব হিয়ারিং।"

ঠাক্‌মা তেড়ে যান এবার, "তবে রে, আমার ওপর দিয়ে বিদ্যে ফলানো হচ্ছে !"

কলির ঠাক্‌মা আর-সব ঠাক্‌মার মতো নন। হাইস্কুলে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন একসময়। শীতকালের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে আর-সব ঠাক্‌মা যখন বড়ি পাহারা দিচ্ছেন, কি কাশীদাসী মহাভারত নিয়ে মশগুল, তখন এই ঠাক্‌মা ইংরেজি উপন্যাস পড়েন, ট্রানজিস্টর পেতে ক্রিকেট শোনেন। সাদা সিঁথি, মাথা ভরতি ধবধবে সাদা চুল, পরনে সবুজপাড় শাড়ি। পায়ের গোড়ালি, হাতের কনুই আর থলথলে গাল দুটি চকচক করে ক্রিমে। এই ঠাক্‌মা পেনশন পান। ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পড়েন রোজ। ঠাক্‌মার সেন্‌স অব ভিশন খুব প্রখর।

রতন দরজা ঠেলে ঢুকল।

ঠাক্‌মা জিজ্ঞেস করেন, "পেয়েছিস ? গরম তো ?"

কলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে, প্লেটে চারখানা কড়াইশুঁটির কচুরি ব্যাঙের মতো ফুলে রয়েছে। তার পাশে একটা পাটালিগুড়ের ঢেলা। ওর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

থাবড়া মেরে কচুরিগুলো ফাটিয়ে দিতেই ভুশভুশ করে খানিকটা বাষ্প বেরোয়। সেই বাষ্পে কড়াইশুঁটি ভাজার সুগন্ধ। একটা গোটা কচুরি মুখে ফেলে দেয় কলি।

ঠাক্‌মা পাশ থেকে বলে ওঠেন, "এই হল সেন্‌স অব স্মেল অ্যাণ্ড সেন্‌স অব টেস্ট। পাঁচরকম সেন্‌স দিয়ে হয় মানুষের পারসেপ্‌শন বা বহির্জগতের উপলব্ধি। তাই তো ?"

"পোকাদের যেমন অ্যানটিনা থাকে, আমরা যাকে শুঁড় বলি, আমাদের সেইরকম নাক, কান, চোখ, জিভ আর গায়ের চামড়া, তাই না ঠাক্‌মা ? তা হলে—"

"ত হলে, কী ?"

"ওরা যে বলে সিক্‌স্‌থ সেন্‌স। ছ'নম্বর একটা অ্যান্‌টিনার কথা। ডিটেক্‌টিভদের থাকে, সেটা কী বইতে কোথাও

লেখা নেই, তুমি নিশ্চয় জানবে।"

ঠাক্‌মা হাসেন। কলিকে বোঝান, ওটা কিছু না। ওটা একটা ভ্রম। বা, পাঁচটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে সক্রিয় হলে, মনে হয়, ষষ্ঠ কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করছে শরীরে। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এ-নিয়ে একটা মজার গল্প আছে।

"বলো, বলো, ঠাক্‌মা।" কলির আর তর সয় না।

"আগে হাত ধুয়ে এসো। ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধোবে। হাতকাটা সোয়েটার পরবে। বই গুছিয়ে রাখবে, তারপর বলব।"

সন্ধে নামছে দেখে রতন শুকনো কাপড়চোপড় ভেতরে তুলে আনে। জানলাগুলো একটা-একটা করে বন্ধ করে, না হলে মশা ঢুকবে। বারান্দার কোলে কাচের দরজা, কব্জা দেওয়া চারপাল্লার দরজা, শেষকালে বন্ধ করল। তারপর ছোট্ট মাটির ধুনুচির মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিল ঘরে ঘরে। মা-বাবা কাজ থেকে ফেরার আগে নিত্য সান্ধ্যকৃত্য সব সারা।

"বলো সেই গল্পটা, ঠাক্‌মা।" কলি রেডি হয়ে ঠাক্‌মার গা ঘেঁষে বসল।

"গল্প ঠিক নয়। সত্যি ঘটনা। জার্মানিতে ঘটেছিল এই শতকের গোড়ায়। আমি কাগজে খবর পড়েছিলাম।

"ফন অস্টেন নামে একটি লোক ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ করত। ঘোড়াদের শুশ্রূষা করত। ট্রেন করত। সে একদিন ঘোষণা করল, তার আস্তাবলের একটি ব্রাউন রঙের ঘোড়া, কপালে লম্বা সাদা দাগ, মোটা চামরের মতো লেজ, নাম হান্‌স, সে নাকি অলৌকিক কাণ্ড করতে পারে। কী কাণ্ড? না, সে সবরকম অঙ্ক কষতে পারে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল, যা বলো।"

"চামর কী ঠাক্‌মা?"

"ঠাকুরপুজোয় লাগে একরকম লোম দেওয়া পাখা। তো যা বলছিলাম। আমাদের দেশে এ-রকম ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। নিরক্ষর সাদা-সিধে গ্রামের মানুষ, দুস্থ অভাবগ্রস্ত, যা শোনে, তা-ই বিশ্বাস করে। কোথায় কোন্ সাধু গাছের তলায় বসে এক চিমটি মাটি তুলে রোগীর হাতে দিচ্ছে, আর সেই মাটি খেয়ে সেরে যাচ্ছে সব অসুখ। কোথায় এক বাবাজি কপাল দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে লোকের, তার জন্যে হাজার হাজার লোক ভিড় করে এদেশে। শুধু মানুষ কেন, গোরুকে নিয়ে, ছাগলকে নিয়ে নানা অলৌকিক গল্প শোনা যায় হামেশা। সব চোখে ধুলো দেওয়া ম্যাজিক।

"তবে, এ হল জার্মানি বলে দেশ। ওরা এত সহজে মানবে কেন। ওরা সব কিছু খতিয়ে না দেখে বিশ্বাস করবে না। গ্রামের লোক জড়ো হয়ে ফন অস্টেনকে বলল, 'দেখি তোমার ঘোড়া, দেখি তোমার হান্‌স কেমন অঙ্ক কষতে পারে। প্রমাণ দাও।'

"খোলা মাঠে বসল সভা। একদিকে দর্শকদল বসেছে, অন্যদিকে দাঁড়িয়েছে ফন অস্টেন আর হান্‌স। হান্‌সের সামনে ব্ল্যাকবোর্ড, হান্‌সের পায়ের নীচে কাঠের তক্তা।

"ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে একটা অঙ্ক লিখল ফন অস্টেন। ধরো, লিখল, ৭২ কে ৯ দিয়ে ভাগ; যার ভাগফল হবে ৮। কিছুক্ষণ অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থাকে হান্‌স। মাইল মিটারের কাঁটার মতো নড়তে থাকে ওর কানদুটো। ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস ছাড়ে। তারপর সামনের ডান পা ঠুকতে শুরু করে কাঠের তক্তায়। ঠক, ঠক, ঠক, ঠক। সবাই অবাক হয়ে দেখল, পরপর আটবার শব্দ করে থেমে গেল ঘোড়াটা। এইভাবে যোগ করা দেখাল, বিয়োগ, গুণ, বর্গমূল। সব। প্রত্যেকবারই ঘাড় ঘুরিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে আর দর্শকদের দিকে তাকায় হান্‌স, কান নাড়ে, লেজ নাড়ে, উত্তেজনায় নিশ্বাস ঝাড়ে ফোঁসফোঁস করে। তারপর আস্তে-আস্তে ঠকঠক ঠুকতে থাকে পা। থামে না কোথাও। ঠুকতে ঠুকতে যেই উত্তরের সংখ্যায় পৌঁছয়, অমনি থামিয়ে দেয় পা ঠোকা। ওর পা ঠোকা শুনে শুনে উপস্থিত লোকেরা গুনতে থাকে প্রথম থেকে, যত বড় সংখ্যাই হোক, হান্‌সের উত্তর নির্ভুল।

"দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। সাংবাদিকরা এসে দেখে গেল, কাগজে বড় বড় করে খবর বেরুল। হান্‌সের ছবি বেরোল: বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটো চোখ, খাড়া কান, কপালের ওপর লম্বা সাদা দাগ। ফন অস্টেনের খ্যাতি বাড়তে লাগল ক্রমশ। ঘোড়ার মতো জানোয়ার, যার পক্ষে, মানুষের ভাষা পড়তে পারাই অসম্ভব, সে কিনা মানুষের ভাষায় অঙ্ক অবধি কষতে শিখেছে। অবিশ্বাস্য হলেও এ যে সত্য ঘটনা, বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এসে, স্বচক্ষে দেখে, তা স্বীকার করলেন।

"এইভাবেই চলছিল। সেয়ানা ঘোড়ার কেরামতি দেখিয়ে ফন অস্টেন কিছু ডয়েশ মার্ক কামিয়েছে ততদিনে। ও যে আর-সব ঘোড়াদের মতো নয়, ও যে প্রতিভাবান, যাকে বলে বিরল প্রতিভা, উপলব্ধি করে হান্‌সও বেশ গর্বিত। ওর কেশর নাড়ানো দেখে তা বোঝা যায়।"

"কেশর কী ঠাক্‌মা?" কলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে।

ঠাক্‌মা বিরক্ত হন। কলির শ্যাম্পু করা চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলেন, তোমার যেমন কেশ, সিংহ, ঘোড়া—এদের থাকে কেশর। পুরুষদের। মাথায় নয়, ঘাড়ে। তুমি তো জানো। ইশকুলে কি বাংলা একেবারে পড়ানো হয় না?"

ঠাক্‌মা গল্প শুরু করেন আবার।

"সব ছোট গল্পের মধ্যে আর-একটা বড় গল্পের বীজ লুকনো থাকে। এখানেও ছিল।

"মনস্তত্ত্বের ছাত্র একজন যুবক সকলের সঙ্গে শো দেখতে এসেছে একদিন। ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে। প্রথম সারিতে বসে হান্‌সের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করছে মন দিয়ে। ধরো, তার নাম গেয়র্গ। ইংরেজিতে যাকে জর্জ বলে, জার্মান ভাষায় বলে গেয়র্গ।

"ধরো, বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা হয়েছে ১৬৯। হান্‌সকে এর বর্গমূল বার করতে বলা হল। দর্শকদের অনেকেই জানে, এর উত্তর ১৩, কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডে তো তা লেখা নেই। হান্‌স পা দিয়ে ট্যাপ করতে শুরু করল যথারীতি। এক দুই তিন—করতে করতে নয় দশ এগারো। দর্শকরা উত্তেজিত, পারবে কি? পারবে কি? হান্‌স কান নাড়ছে ঘন ঘন, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, ছটফট করছে লেজ। ক্রমশ ওর পা ঠোকা মন্থর হয়ে এল। সবাই অধীর উল্লাসে লক্ষ করল তেরো বারের পর পা ঠুকে থেমে গেল হান্‌স। অমনি সমবেত হাততালি। দর্শকরা ছুটে এসে পিঠ চাপড়ায় হান্‌সের। হাত মেলায় ফন অস্টেনের সঙ্গে।

"এমন সময় গেয়র্গ এক কাণ্ড করে।

"ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গেয়র্গ। চিৎকার করে বলল, 'আর একবার। আর একবার আমরা দেখতে চাই।'

"এই না বলে সে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ১৬৯ সংখ্যাটা মুছে দিল। তারপর খড়ি দিয়ে ওই একই সংখ্যা লিখল আবার। বলল, 'বর্গমূল কষে দাও হান্স।'

"তারপর সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে বলে, 'বন্ধুগণ, অঙ্ক কষার সময় আপনারা দয়া করে মাথা নিচু করে থাকুন, হান্সের দিকে তাকাবেন না। আর, মিস্টার অস্টেন, আপনি দয়া করে দর্শকদের মধ্যে এসে বসুন। আমরা চুপি চুপি শুনব। ওর খুরের শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।'

"হান্স ট্যাপ করতে শুরু করে যথারীতি। কিছুদূর এগিয়ে ও অস্বস্তি অনুভব করে। নীরব জনতার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, প্রভুর দিকে অসহায়ভাবে তাকায়, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। উত্তেজনা নেই। তবু ট্যাপ করে যাচ্ছে সে। দশ এগার বারো—ট্যাপ করে যাচ্ছে। একই গতিতে ট্যাপ করে গেল তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো—পা ঠুকেই যাচ্ছে হান্স, থামছে না।

"জনতা স্তম্ভিত। ফন অস্টেন হতভম্ব। একটু আগে অঙ্কটা পেরেছে হান্স, এবারে পারল না! কেন পারল না।

"গেয়র্গ মনস্তত্ত্বের ছাত্র। সকলকে বুঝিয়ে বলে, 'বন্ধুগণ, বিচলিত হবেন না। এতে কারও দোষ নেই। এরকমটা হতে পারে, আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। এ ঘোড়া সেয়ানা, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ও অঙ্ক জানে না।'

"সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'সে কী?'

"হ্যাঁ। এতকাল ও ঠিক উত্তর দিয়ে এসেছে আপনাদের মুখ দেখে। আপনাদের উত্তেজনা যত বেড়েছে, ওর পা ঠোকা তত মন্থর হয়েছে। শেষে যখন আপনারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, ও পা ঠোকা থামিয়ে দিয়েছে তখনই। বলতে গেলে, আপনারাই ওকে অঙ্ক কষতে সাহায্য করেছেন। আর এখন কী হল? আপনাদের সহযোগিতার অভাবে হান্স বেচারি বুঝে উঠতে পারল না কোথায় ওকে থামতে হবে। তাই, ট্যাপ করেই চলল বোকার মতন।'

"একটু থেমে গেয়র্গ আবার বলে, 'বন্ধুগণ, আপনারা হান্সকে অভিনন্দন জানান। মিস্টার অস্টেন, আপনি কাঁদবেন না, আপনি জানেন না, ও কত বড় কাজ করেছে। আপনার ঘোড়া আজ মনস্তত্ত্ববিদ্যার একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে, প্রথাসিদ্ধ পথে ছাড়াও উপলব্ধি হওয়া সম্ভব।'

"রোজগার বন্ধ হয়ে গেল ফন অস্টেনের। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল ওর। মনস্তত্ত্ববিদ্যায় যুক্ত হল একটি অধ্যায়, যাকে বলে 'ক্লেভার হান্স এরর'।"

"অর্থাৎ সিক্স্থ সেন্স। ছ নম্বর অ্যানটিনা।" কলি হাসতে হাসতে বলে, "আমার কিন্তু ঘোড়াটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।"

ঠাক্মা বলেন, "আমারও হয়েছিল। খবরটা যখন পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল, কিছু-কিছু ভুলভ্রান্তি থাক না, কী দরকার সত্য উদ্‌ঘাটনের। কিন্তু বিজ্ঞান তো সে-কথা শুনবে না।"

ছবি : দেবাশিস দেব

জেনে নাও

দুধে সর পড়ে কেন

গরম দুধ ঠাণ্ডা হলে তাতে সর পড়ে যায়। কড়ার উপরে মস্ত সর কিংবা কাপে, গেলাসে খাবার জন্যে দেওয়া দুধের উপরে পুরু সর। দুধে সর পড়ে কেন?

দুধে মাখন জাতীয় স্নেহপদার্থ থাকে। এই স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে দুধের সঙ্গে মিশে। যেই তাপ দেওয়া হয় বা দুধ ফোটানো হয়, অমনি খানিকটা মাখন আলাদা হয়ে যায়।

এই মাখনটা থাকবে কোথায়? দুধের ওপরে না ভেতরে?

মাখন দুধের থেকে হালকা আর যা হালকা তা থাকবে ওপরে। তাই স্নেহজাতীয় পদার্থ মাখন ভাসে দুধে। আর যেই দুধ ঠাণ্ডা হয়, অমনি স্নেহজাতীয় মাখন সরের চেহারা নেয়। আমরা দেখি, দুধের উপরে সর পড়েছে।

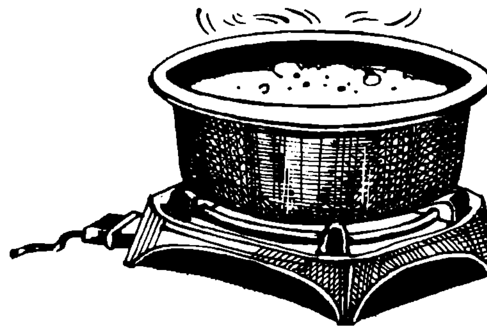

কাঁসা কী

কাচের গ্লাস কাচের প্লেটের মতো কাঁসার থালা, বাসন, গ্লাস আছে।

যে কাঁসায় এই থালা, বাসন, গ্লাস তৈরি, সেই কাঁসাটা কী? এটা কি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়? নাকি, এই কাঁসাকে আলাদাভাবে তৈরি করতে হয়?

কাঁসাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বেল মেটাল। এটি প্রকৃতিতে এমনি পাওয়া যায় না। এটি তৈরি করতে হয়, এবং তার জন্যে দরকার তামা আর টিন। এই দুটি ধাতুকে ওজনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে তবে কাঁসা পাওয়া যায়।

কাঁসায় তামার ভাগ শতকরা ৬০ থেকে ৮৫ পর্যন্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ ওজনের হিসেবে ১০০ ভাগ যদি নিই কাঁসা, তাহলে তামার ভাগ ৬০। বাকিটা টিন।

এই মিশ্র ধাতুতে সামান্য আঘাত করলেই খুব বেশি স্পন্দন হয়ে উচ্চ গ্রামের শব্দ তৈরি হয়। তাই এই কাঁসা দিয়ে ঘন্টা তৈরি হয়।

শুনলে অবাক হওয়ার কথা, আমাদের দেশে কাঁসার ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এখন অবশ্য স্টেনলেস স্টিলের বাসন এত বেশি চলছে যে, কাঁসার বাসন তেমন আর ব্যবহার করা হচ্ছে না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন

সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2668 BEN

ভাইফোঁটা

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ভাইফোঁটা। সকাল থেকেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে। কোন্ বাড়ির মেয়েরা যেন অনেকক্ষণ ধরে উলু দিল। সবার মনেই কেমন আনন্দ। হৈ-চৈ। শুধু রিনিদের বাড়িটা চুপচাপ। রিনিরা তিন বোন। দীপা, রুপা আর রিনি। ওদের কোনো ভাই-ই নেই। কাকে ফোঁটা দেবে? সকালবেলা চানটান করে লালপাড় শাড়ি পরে ওদের মা গেছেন ভাইফোঁটা দিতে মামার বাড়িতে। ফিরতে-ফিরতে সেই সন্ধে।

রিনি বলল, "বড়দি, মা কখন ফিরবে রে?"

দীপা বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, "বিকেলবেলার দিকেই চলে আসবে মা।"

রিনি বলল, "মা ছোটমামার জন্যে কী কিনেছে?"

রিনির কথা দীপার কানে গেল না। ও অন্যমনস্ক হয়ে বলে উঠল, "সত্যি নিউটন... !"

রুপা ক্রিকেট খেলতে বাড়ির সামনের মাঠে যাচ্ছিল। ও হেসে বলল, "দিদি, মা ভাইফোঁটায় ছোটমামাকে বিজ্ঞানী নিউটন প্রেজেন্ট করবে?"

দীপা বলল, "যাঃ।"

রুপা বলল, "তুই তো তাই বললি দিদি।"

ব্যাপার-স্যাপার দেখে রিনির মুখ ভার। এই ভাইফোঁটার দিনে ওদের তিন বোনের যে ফোঁটা দেওয়াই হচ্ছে না। সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

দীপা, রুপা দুই বোন সত্যিই ভাইফোঁটা নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছে না। দীপা ক্লাস নাইনে পড়ে। পড়াশুনোয় ভীষণ ভাল। পড়ায় মনও খুব। বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ এখন থেকেই ওর মধ্যে প্রবল। চোখে এরই মধ্যে হাই-পাওয়ারের চশমা উঠেছে। সাজগোজ, খেলাধুলো—কোনোদিকে ওর মন নেই। শুধু পড়া আর পড়া। আজ যে ভাইফোঁটা দীপার মনেই নেই।

রুপা আবার খেলা বলতে পাগল। ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ছাড়া ও আর কিছু জানে না। তবে ক্রিকেটেই বেশি ঝোঁক। আজ ছুটির দিন। সকালবেলাতেই ওর একবার মাঠে নামা চাই। নইলে সারাদিন মনটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে থাকে। ছোট করে চুল ছেঁটে সাদা প্যান্ট-শার্ট পরে ও মাঠে নামে, তারপর ফিরে এসে পড়তে বসা। ওদের বাবা বলেন,

"আমার এগারো
বছরের ক্ষুদে ফুটবল
খেলোয়াড় একদিন
ও হবে বিশ্বের সেরা
ফরোয়ার্ড প্লেয়ার—"

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

OBM/3784 BEN

"রুপা, পড়াশুনোয় আর একটু মন দে। ক্লাস এইটে উঠলি. সে খেয়াল আছে ?"

রিনি কথাটা ভাবল। দিদিরা যে ভাইফোঁটা দিতে পায় না, সে খেয়াল তো নেই। সেজন্য ওদের মনে কোনো দুঃখ নেই। অথচ চোখের সামনেই তো দেখছে মা-বাবা পর্যন্ত ভাইফোঁটা দিতে আর নিতে চলে গেলেন।

রিনির মন খুব খারাপ। এতই খারাপ যে ও ছাতে চলে যাচ্ছিল। দীপা সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, "এই, তুই ছাতে যাচ্ছিস কেন রে ?"

রিনি বলল, "এমনি।"

দীপা জানে এমনি এমনি নয়। মন-টন খারাপ হলেই রিনি একলা-একলা ছাতে বসে থাকে। ও একেবারে বাড়ির ছোট বলে কেউ কিছু বলে না। দীপাও একটু যেন বেশি ভালবাসে ওকে। ছোট্ট বোনটা ওর চোখের সামনেই একটু-একটু করে বড় হল। ছোটবেলায় রিনি বলত—দিয়া দিয়া। দীপা বলতে পারত না। কী আধো-আধো কথা। দীপার আবার নতুন করে মনে পড়ে সে-সব দিন।

ও আদর করে রিনিকে কাছে টেনে বলল, "ক্লাস ফাইভে উঠবি ছোটখুকি, স্কুল খুললেই পরীক্ষা। চল তোকে অঙ্ক কষাব।"

রুপা ব্যাট দোলাতে-দোলাতে বলল, "হ্যাঁ, ও করবে অঙ্ক। তাহলেই হয়েছে। সকাল থেকেই মুখখানা কী রকম বাংলা পাঁচের মতন করে আছে।" দীপা বলল, "অ্যাই, ছোটখুকিকে ওরকম করে বলিস না। ওর মন ভাল নেই দেখছিস না।"

রুপা রিনিকে কোলে করে একপাক ঘুরিয়ে বলল, "কেন রে, তোর কী হয়েছে ? কে কী বলেছে একবার বল্ তো দেখি ? এই ব্যাট দিয়ে তার মাথাটা ভাঙব আমি।"

দীপা বলল, "থাক থাক, আর বীরত্বে কাজ নেই। তুই মাঠে যাচ্ছিস যা।"

রুপা অমনি হাসিমুখে বলল, "রিনির কেন মন খারাপ আমি জানি।"

"কেন ?"

"ওই যে ফোঁটা দিতে পারছে না, সেইজন্যে।"

দীপা বলল, "ওমা এই কথা ? ও গোবিন্দদা, শিগগির চন্দন ঘষে নিয়ে এসো। আমি রিনিকে ফোঁটা দেব। রিনি, তুই রসোমালাই খাবি, না ক্ষীরের জিলিপি ?"

রসোমালাই ক্ষীরের জিলিপি দুটোই রিনি খেতে ভালবাসে। সে-জন্যেই দীপা বলেছে। তবু রিনির মুখ ভার।

রুপা রাগ করে বলল, "ও মেয়ের মন তুমি পাবে না দিদি। ওর বায়নার শেষ নেই। তারচেয়ে দাও আমাকে দুটো ভাল বল কিনে, দ্যাখো আমি তোমার জন্যে কী করি।"

রিনি অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, "আমি তো বোন ফোঁটা তো দেয় ভাইদের। মউ-পিউ রত্না-স্বপ্না ওরা তো ওদের ভাইদের ফোঁটা দেবে, জানো সে কথা ?"

আসলে ভাইফোঁটার পরের দিনই তো স্কুল খুলছে আর স্কুল খুললেই মউ-পিউ রত্না-স্বপ্নার দল বলাবলি করবে—ওহ্ কাল যা কাণ্ড আমাদের বাড়িতে হল, আমার বড়দা রাঙাদা সব্বাই ফোঁটা নিয়েছে, আর যা সুন্দর-সুন্দর সব জিনিসপত্র দিয়েছে। রিনি, চল দেখে আসবি।

রিনি দীপা আর রুপাকে ওর দুঃখের কথা বলেই ফেলল। দীপা বলল, "পড়াশুনো বাদ দিয়ে এইসব উলটোপালটা কথা ভাল নয়। ভাল-ভাল জিনিসপত্র দিলেই বুঝি ভাল ?"

রুপা চুল ঝাঁকিয়ে বলল, "ভাই নেই তো কী হয়েছে ? ভাই নিয়ে আমাদের কী লাভ হত ? ভাইরা তো খুব বোকা হয়, ওদের মাথায় একটুও বুদ্ধি থাকে না। তা জানিস ?"

রিনি বলল, "তবে যে রত্না বলে—ওর রাঙাদার খুব বুদ্ধি। খুব সাহস। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা—কারুকেই ভয় করে না।"

রুপা বলল, "তুইও ওদের বলিস আমার বড়দি সায়েন্টিস্ট, আমার ছোড়দি ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের শিষ্যা ? কী বলবি না ?"

রিনি চোখ মুছতে-মুছতে মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ' কি 'না' ভাল করে বোঝা যায় না।

রুপা বলল, "দূর ছাই, খেলার মুডটাই আজ আমার নষ্ট হয়ে গেল। কী রে দিদি, দিবি নাকি আমার পাওনা টাকাটা ?"

দীপা বলল, "পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হলে সত্যি বলছি ...।"

দীপার কথা শেষ হয় না। রুপা বলে ওঠে, "পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড না হলে সে বুঝি একেবারে ফ্যালনা ?"

রুপার চোখমুখ লালচে। রুপা বেশ রেগে গেছে। রুপা বলল, "তুই জানিস দিদি আমি ক্রিকেট খেলি বলে স্কুলের দিদিমণিরা আমাকে কত ভালবাসেন ? বড়দিমণি তো আমাকে ঝাঁসির রানি বলে ডাকেন ?"

দীপা হেসে বলে, "আমি তোকে কি তাই বলেছি ? তুই ফ্যালনা ? ওহ্ এত ঝগড়া করতে পারে এই প্লেয়ার মেয়েগুলো ?"

দিদিদের ঝগড়াঝাটিতে রিনির কিন্তু মন নেই। সে বেশ বুঝে গেছে এইরকম করতে করতেই দিনটা কেটে যাবে। ভাইফোঁটা দেওয়া হল আর না হল ভারী বয়ে গেছে ওদের। মা-বাবাও একটু পরে ফিরে আসবেন। ব্যস। দিন শেষ। সকাল হলেই স্কুলের তোড়জোড়। তারপর স্কুলে গিয়ে ...। হ্যাঁ সেইটেই তো ভয়। রত্নারা বলবে—কালকের দিনটা যা কেটেছে রিনি। সে তুই চিন্তাও করতে পারবি না।

রিনি তার বাবার ঘরে গিয়ে বসে বসে ভাবে। বাবা থাকলে এখুনি একটা বুদ্ধি দিয়ে দিতেন!

"মা, চারটি ভিক্ষে হবে ? দুদিন ভাল করে খাইনি মা।" রিনি শুনতে পায়। রিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে। সেই ছেলেটা, প্রায়ই এদিকে আসে ভিক্ষে করতে। কোথায় থাকে কে জানে। ভিক্ষে করেই দিন কাটায়। এবার অনেকদিন পর এসেছে।

"মা চারটি ভিক্ষে দেবেন ?"

রান্না করতে করতে খুন্তি হাতেই গোবিন্দ দরজা খুলে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "মা, চারটি ভিক্ষে দেবেন! লজ্জা করে না ভিক্ষে চাইতে ? এত বড় ছেলে। যাও খেটে খাওগে।"

ছেলেটা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। বছর-দশেক বয়স হবে ছেলেটার। পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, খুব একটা রোগা নয়, আর চোখ দুটি বেশ বড়-বড়, ভাসা-ভাসা।

গোবিন্দর চেঁচামেচি শুনে, তিন বোনই দরজার গোড়ায়।

দীপা বলল, "এই তোর নাম কী রে ?"

রুপা বলল, "তোকে তো মাঝে-মাঝে এদিকে দেখতে পাই, থাকিস কোথায় ?"

রিনি বলল, "ভাইফোঁটার দিন তুমি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ কেন ? তোমার বোন নেই ?"

গোবিন্দ মুখ গোমড়া করে ওদের বকুনি দিয়ে বলে, "চলো তো সব। আমাকে দরজা বন্ধ করতে দাও। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার এত বড় একটা ছেলে কোথায় কাজ করে খাবে তা না ভিক্ষে ! লজ্জা করে না ? যাও, এখানে কিছু হবে না।"

ছেলেটা এবার একটু ফুঁসে ওঠে, "দেবেন না দেবেন না, কিন্তু মুখ করছেন কেন ?"

রুপা ফিসফিস করে দীপার কানে কানে বলল, "একেবারে ধানিলঙ্কা।"

দীপা বলল, "গোবিন্দদা, এটা তোমার অন্যায়, তুমি শুধু শুধু ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ।" একটু দুঃখিত না হয়ে গোবিন্দ বলল, "তোমরা এসব বুঝবে না, ওরা হচ্ছে গুণ্ডাদের চর, লোকেদের বাড়ি-ঘরদোর চিনে তারপর খবর দেয়।"

"তারপর ? তারপর কী হয় ?" রিনি জানতে চাইল।

গোবিন্দ হাত-পা নেড়ে বলল, "তারপর আবার কী ? যা হবার তা হয়। ডাকাতি হয়। লুটপাট হয়।"

রিনি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "যাহ্, এ ছেলেটা এরকম নাকি ?"

দীপা বলল, "ঠিক, ছেলেটার চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ও ভাল ছেলে।"

রুপা বলল, "দিদি, ওর মুখটা ঠিক 'পথের পাঁচালী'র অপুর মতন না ?"

ছেলেটার চোখে বোধহয় একটু জল এসেছিল গোবিন্দর বকুনির চোটে, ও ধরা গলায় বলল, "আমার বাড়ি তো পথের পাঁচালীতে নয়।"

দীপা হেসে বলল, "তা হবে কী করে ?"

ছেলেটা বলল, "কিন্তু আপনারা আমার নাম জানলেন কী করে ?"

তিন বোনই একসঙ্গে বলে ওঠে, "কই, তোমার নাম আমরা জানি না তো।"

ছেলেটা বলল, "বাঃ, ওই যে বললে অপু ! আমার নাম তো অপু।"

"তোমার নাম অপু ? ও মা তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমি তো খুব অপয়া। আমি হয়েই আমার মাকে খেয়েছি বাবাকে খেয়েছি। আমাকে যে বুড়ি দিদিমা মানুষ করত তাকে খেয়ে এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

দীপা রাগ করে বলল, "ছিঃ এ আবার কী রকম কথা ? মা খেয়েছি বাবা খেয়েছি ? মা বাবাকে আবার কেউ খায় নাকি ?"

"সবাই তো বলে আমারই দোষ, আমি অপয়া।"

রুপা বলল, "বুঝলি দিদি, অপয়া থেকে ও হয়ে গেছে অপু।"

রিনি বলল, "তুমি এখন পথে-পথে ভিক্ষে করো ?"

অপু নামের ছেলেটা বলে ওঠে, "না, রোজ ভিক্ষে করি না। যেদিন ওরা খেতেটেতে দেয় না, সেদিন একটু এদিকে চলে আসি।"

অপু নিজেই জানাল, বড় রাস্তার ওপারে হলুদ বাড়ির গ্যারেজে ও থাকে। ড্রাইভারের ফাইফরমাস খাটে, গাড়ি ধোয়ামোছা করে। তার বদলে দুবেলা খাবার আর রাত্রে শোবার জায়গাটুকু মেলে। তা, ড্রাইভার তো সবদিন থাকে না। গাড়ি নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যায়। তখন অপুর বড় কষ্ট। দু'দিন চারদিন ভিক্ষে করেই তাকে দিন কাটাতে হয়।

রুপা বলল, "তুমি লেখাপড়া জানো ?"

অপু চলে যেতে যেতে বলল, "না তেমন না, একটু-একটু।"

রিনি বলল, "বাহ্ ! তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? ভিক্ষে নিয়ে তবে তো যাবে।"

রুপা বলল, "হ্যাঁ তাই তো, বোসো তুমি।"

অপু বলল, "আজ থাক, আর একদিন আসব।"

গোবিন্দ ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, "বাবুর রাগ হয়েছে।"

দীপা বলল, "হবেই তো, তুমি শুধু শুধু ও রকম করে কথা বলেছ কেন ?"

রুপা বলল, "দেখ দিদি, অপুর গেঞ্জিটা বড্ড ছেঁড়া, না ? আমার সাদা পাঞ্জাবিটা ওকে দিয়ে দেব ?"

রুপা খেলাধুলো করে বলে ওর পোশাক-আশাকও অন্যরকম। ওর অনেক প্যান্ট-শার্ট-পাঞ্জাবি আছে।

রুপা বলল, "ছোটখুকি, আমার ওয়ার্ডরোব থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে আয় তো।"

রিনি এক ছুটে গেঞ্জিটা নিয়ে আসে। একেবারে মাপমতন না হলেও মোটামুটি হয়ে যায়। দীপা বলল, "যাহ্, প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি একটুও মানাছে না। ওকে একটা ধুতি পরিয়ে দে।"

রুপা মুখ ভার করে বলল, "ধুতি তো আমার নেই।"

রিনি বলল, "বাবার তো আছে, আলমারি থেকে নিয়ে আসি ?"

দীপা কিছু বলার আগেই রিনি ছুট লাগায়। হাঁপাতে-হাঁপাতে একখানা কাচা ধুতি নিয়ে হাজির।

রুপা বলল, "নাও, ধুতিটা পরে ফেলো দেখি। বেশি দেরি কোরো না, গোবিন্দদা দেখতে পেলে আমাদের রক্ষে থাকবে না।"

শালপাতায় মোড়া রাত্রিবেলাকার বাসি খাবারদাবার হাতে গোবিন্দ এসেই চমকে যায়। "এ কী করেছ তোমরা। বাবুর ধুতি নিয়ে... ? অ্যাঁ ? আর আমাকে মা-ঠাকরুন রাখবেন না, বাড়ি ঢুকেই তাড়িয়ে দেবেন। অ্যাই ছোঁড়া, খোল, খুলে ফেল ধুতি।"

ছেলেটা ধুতিটা পরে পাঞ্জাবির কাজগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। খুব পছন্দ হয়েছে, খুবই খুশি হয়েছে সে।

দীপা, রুপা, রিনি—তিন বোনেরই চোখে পলক পড়ে না। ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছেলেটা সত্যিই একেবারে পালটে গেছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

রুপা বলল, "দিদি, এক কাজ করবি ?"

দীপা বলল, "কী ?"

রুপা বলল, "অপুকে আমরা ভাইফোঁটা দিই না ?"

রিনি বলল, "ভাইফোঁটা ?"

দীপা একটু ভেবে নিয়ে বলল, "মন্দ বলিসনি কিন্তু, চল

আমরা ওকে কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিই।"

রিনি বলল, "কিসের ফোঁটা দেবে ? চন্দনের তো ? আমি ঘষে আনি ?"

অপু বলল, "আপনারা আমাকে ভাইফোঁটা দেবেন ?"

রুপা বলল, "হ্যাঁ, কেন তোমার ইচ্ছে নেই ?"

অপু বলল, "না।"

রিনি রাগ করে বলল, "সত্যি ওর বড্ড ডাঁট।"

অপু বলল, "না না, তা নয়, আমি তো এখনও চানই করিনি। চান না করে তো ফোঁটা নেওয়া যায় না।"

দীপা বলল, "ঠিক কথা। তাহলে তুমি চান করে নাও। রিনি, যা ওকে বাথরুম দেখিয়ে দে। সাবান-টাবান কী লাগবে সব দিয়ে আয়।"

গোবিন্দর চোখ ছানাবড়া। ও আর কত রাগ করবে, কত চেঁচামেচি করতে পারে। এবার যেন শুধু অবাক হওয়ার পালা।

একবার করে রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়ায় আর বলে, "তোমরা যা খুশি করছ করো। কিন্তু আমার দোষ যেন না হয়। আমি কিছু জানি না, কর্তাবাবু কিছু বললে আমি কিন্তু তোমাদের দেখিয়ে দেব।"

রুপা বলল, "তুমি চুপ করবে গোবিন্দদা ? দেখছ না আজ ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটার দিন চেঁচামেচি করতে আছে ?"

আধ ঘণ্টার ভেতরে ভাইফোঁটার আয়োজন হয়ে গেল। পান-সুপুরি কলা মিষ্টি কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। রিনি খুশি হয়ে দীপাকে বলল, "দিদি কিন্তু সব জানে।"

রুপা বলল, "বাহ্ ! দিদিরা তো সব জানবেই। তারপর আমাদের দিদি আবার সায়েন্টিস্ট !" দীপা লজ্জা পেয়ে বলল, "বাজে বকবক করিস না। ভাইফোঁটার মন্ত্র মনে আছে ?"

রুপা বলল, "ওমা তাই তো, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়োরে পড়ল কাঁটা। তারপর কী রে ? অ্যাই রিনি, তুই জানিস ?"

রিনি হাসতে হাসতে বলল, "যমের দুয়োরে পড়ল কাঁটা তারপরে তো ? যমের বোন যমুনা সেও দেয় ভাইকে ফোঁটা, আমিও দিই ভাইকে ফোঁটা।"

রুপা বলল, "দিদি, ছোটখুকিটা একেবারে জিনিয়াস। কী বল ?"

রিনি বলল, "আমরা বুঝি শাড়ি না পরে অপুকে ফোঁটা দেব ?"

অপু লাজুক মুখে বলল, "হ্যাঁ, শাড়ি তো পরতেই হবে।"

রিনি আবার বলল, "দিদি, প্রেজেন্ট দিতে হবে না ?"

দীপা রুপা দুজনেই বলল, "সে তো দিতেই হবে। আমরা ওকে নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দেব। কিন্তু তুই তো অপুর থেকে বয়সে ছোট, অপুই তোকে কিছু...।"

অপু দুঃখী-দুঃখী মুখে বলল, "কিন্তু আমি—আমি কী দেব... ?"

দীপা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তুমি ছোটখুকিকে একটা ক্যালকুলেটর দেবে।"

"ক্যালকুলেটর ? সে আবার কী ?" অপু অবাক হয়ে বলল।

দীপা অপুর হাতে ক্যালেকুলেটরটা দিয়ে বলল, "এই

দ্যাখো, এটাতে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ কষা যায়। খুব চটপট হিসেব করা যায়।"

রিনি বলল, "দিদি, এটা তুই আমাকে একেবারে দিয়ে দিলি ?"

দীপা বলল, "আমি দিলাম নাকি ? এটা তো অপু প্রেজেন্ট করছে।"

রুপা একটু হেসে দীপার দিকে তাকায়। দীপা রুপা দুজনেই জানে এই ক্যালকুলেটরটার ওপর রিনির খুব লোভ। রিনি নিচু ক্লাসে পড়ে। ওর এ সব জিনিসে দরকার নেই, তাছাড়া ব্যবহার করাও ঠিক না। কিন্তু দীপার কাজে লাগে। বড়-বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ চটপট করে হিসেব করতে সুবিধে হয়। তাহলে কী হবে ? দীপার ক্যালকুলেটর দেখলেই, রিনির চোখ চকচক করে। কী অবাক করা জিনিস, না ? মুহূর্তে বিশাল-বিশাল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ হয়ে যায়।

দীপা এসব জানে বলেই রিনিকে ক্যালকুলেটর দিয়ে দিল। কাল স্কুলে গিয়ে রত্নাদের কাছে গল্পটা কেমন জমাবে সে এখন থেকেই তার আঁচ পাচ্ছে।

ওরা ভাইফোঁটা দিতে বসেছে, এখনও গোবিন্দ সমানে গজর-গজর করে যাচ্ছে। "আমি কিন্তু কিছু জানি না। সব তোমাদের দোষ।"

ওদের সে-সব কথা কানে যে যাচ্ছে না। রুপা বলল, "দিদি, তুই সবচেয়ে বড়, তুই আগে অপুর কপালে ফোঁটা দিবি।"

দীপা লাল ছাপা-শাড়িতে মুখ মুছিয়ে দিল অপুর। বেশ একটু আদর করে বলল, "রিনিই আগে ফোঁটা দেবে অপুকে।

নট-আউট

সুইঙ আর কাটার-এর জারিজুরি ফক্কা
গুগলী বা টপ্ স্পিন, সবেতেই ছক্কা!
হুক, পুল, লেট-কাট, মার সব চোস্ত
বোলারেরা কাঁদ-কাঁদ, ফিল্ডার ত্রস্ত
এই ছোটে থার্ড ম্যানে, এই ছোটে কভারে
গেল!গেল! ধর! ধর! ফের চার, বাবারে!
রান বাড়ে যত তার রোদ বাড়ে দশগুণ
মাথা করে ঝিমঝিম, ঘেমে নেয়ে হয় খুন।
সন্ধ্যায় ফেরে সব চেহারা কি অপরূপ!
রোদে পোড়া ঝলসানো, জামা ভিজে চুপচুপ।
নট আউট যে ব্যাট্সম্যান হাসিখুশি মূর্তি
সেঞ্চুরী হাঁকড়িয়ে প্রাণভরা ফূর্তি।
একগাল হেসে বলে, এই নিন বোরোলীন
ভাল করে হাতে মুখে এক্ষুনি মেখে নিন।
রোদ-জ্বালা, কাটা-ছড়া সেরে যাবে চটপট।
ফিল্ডিং-এ নামবেন, কাল ফের ঝটপট।

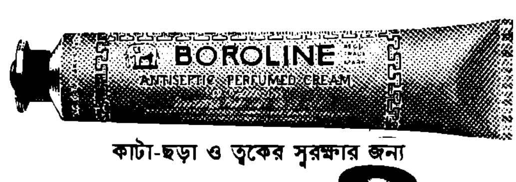

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

GDP-5242

সক্কালেবেলা ভাইফোঁটা ভাইফোঁটা করে ওই তো মনখারাপ করে বসে ছিল।"

রুপা বলল, "ওমা, তাই তো।"

রিনি তার মায়ের বারোহাত শাড়িখানা পরে গুটিগুটি এগিয়ে আসে। অপুর কপালে ফোঁটা দিয়ে মাথা দুলিয়ে সুর করে বলে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা...।"

দীপা রুপা শাঁখ বাজায়। উলু দেয়।

রিনি মনে মনে হেসে ওঠে। এত জোর শাঁখের আওয়াজ হচ্ছে। রত্নারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে। ওরাও নিশ্চয়ই ভাবছে ভাইফোঁটা তাহলে রিনিদের বাড়িতেও হয়।

দীপা বলল, "রুপা, তুই এবার অপুর কপালে ফোঁটা দিবি। তারপর আমি।"

ধান-দুব্বো পান-সুপুরি নিয়ে মিষ্টির থালা সামনে রেখে রুপা ফোঁটা দিতে যায়। ভারী ভাল লাগছে তার। কী রকম অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছে। দীপার মনেও সেই আনন্দ। কোথাকার অচেনা-অজানা একটা ছেলে এইটুকু সময়ের মধ্যে কেমন একেবারে নিজেদের হয়ে গেল। দীপা মনে মনে ঠিক করে নেয়, ছেলেটা কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে। অত সুন্দর ছোট্ট ওই ছেলেটা কেন গ্যারেজে শুয়ে-বসে দিন কাটাবে? খেতে না পেলে ভিক্ষে করা। এরকম হতে পারে না। দীপার চোখ জ্বল-জ্বল করে ওঠে।

রুপা কড়ে আঙুলে চন্দন নিয়ে ফোঁটা পরাতে পরাতেই শুনতে পেল, আবার গোবিন্দদা চেঁচামেচি করছে। "তোমরা যা খুশি করছ করো, আমি কিন্তু কিছু জানি না।"

রুপা রাগ করে বলল, "দ্যাখো গোবিন্দদা, শুভ কাজে বাধা দিতে এসো না। মা-বাবাকে যা বলার আমরাই বলব, তোমার ভয় নেই, তোমাকে কেউ বকুনি দেবে না।"

রিনির ভাইফোঁটা দেওয়া হয়ে গেছে বলে ওর মনের খুব জোর বেড়ে গেছে। তারপর এরকম সুন্দর একটা ক্যালকুলেটর, ভাবা যায়!

রিনি সন্দেশে মস্ত একখানা কামড় দিয়ে বলল, "সত্যি তুমি কিছু জানো না গোবিন্দদা, মা তো অপুকে খুব ভালবাসে। সেইদিনই তো ওকে দেখে মা বলল, আহা রে! কী সুন্দর ছেলেটা কোথায় থাকে কে জানে। কাদের ছেলে, ওর বোধহয় কেউ নেই।"

ফোঁটা দিতে দিতেই রুপা বলল, "সত্যি তোমার মানুষ চেনার ক্ষমতা নেই গোবিন্দদা, তুমি অপুকে বললে কিনা স্পাই? দেখো তোমার কথায় মা-বাবা দুজনেই কীরকম রেগে যাবে।"

রুপা দীপার দিকে তাকিয়ে বলল, "ও দিদি, অপুকে আমরা ছাড়ব না, ও আমাদের কাছে থাকবে! অ্যাই অপু, তুই আমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলবি, কেমন?"

অপু হেলেদুলে হাসে। দীপা হাসতে হাসতে বলল "ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে। কী রে, সায়েন্টিস্ট হবি? রিসার্চ করবি?"

অপু কী বুঝল কে জানে। হাসিমুখে খুব জোরেজোরে মাথা নাড়ল ও।

ছবি: অনুপ রায়

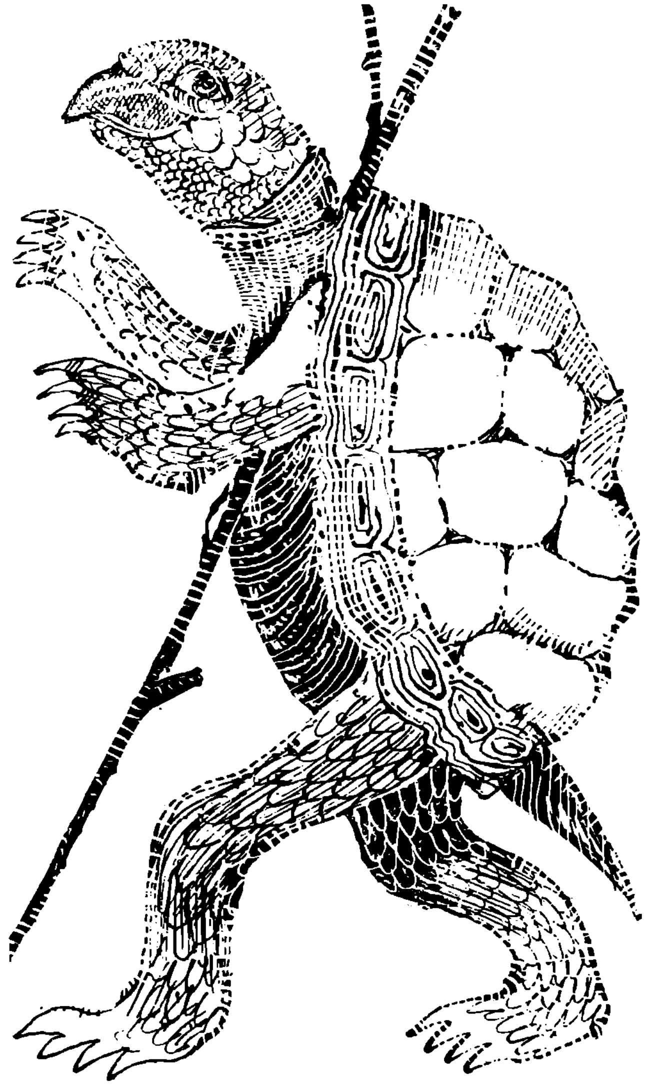

কাছিম বুড়ো

অসিত ভট্টাচার্য

"কাছিম বুড়ো, হাঁটছ কেন,
পিঠে পাথর-সাজ পরে?"
"গায়ে আমার পড়ল কড়া
তিনশো বছর কাজ করে।"
"বুড়ো, তুমি সবার খুড়ো,
বয়েস তোমার অল্প নয়।
আদ্যিকালের গল্প বলো।"
"কাজের সময় গল্প নয়।"
"অ্যাত্তো বছর কাজ করে তায়
হয়েছ উৎফুল্ল কি?"
"জানিস কেবল বলতে কথা,
নইলে, তোদের মূল্য কী?"
"এমনভাবে কোথায় যাবে?
চারদিকেতে কী রোদ্দুর!"
"তেরো নদী পার হয়েছি,
যাব সপ্ত-সমুদ্দুর।"

ছবি: অনুপ রায়

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

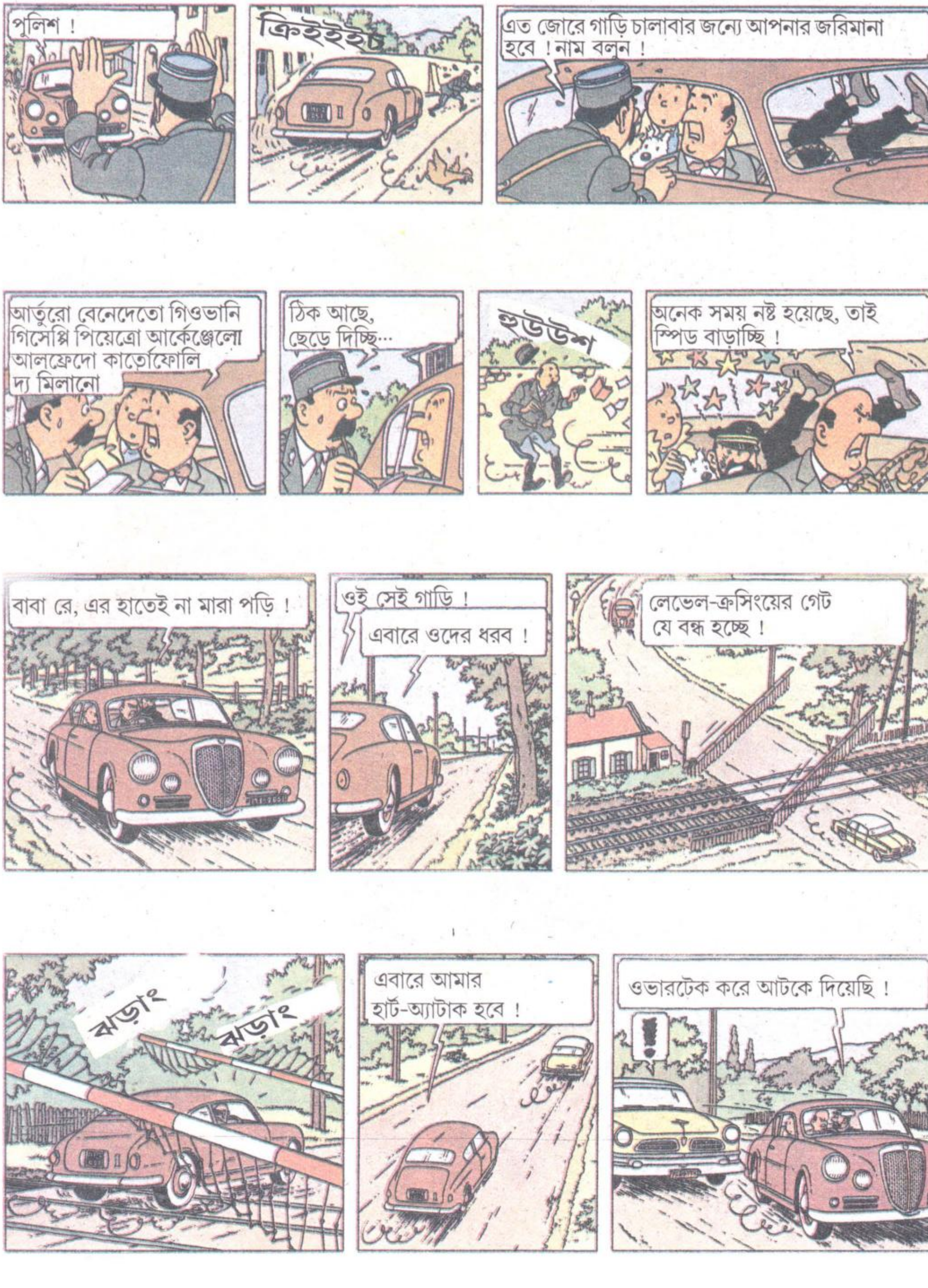

পুলিশ !
ক্রিইইইচ
এত জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে আপনার জরিমানা হবে ! নাম বলুন !
আর্তুরো বেনেদেতো গিওভানি গিসেপ্পি পিয়েত্রো আর্কেঞ্জেলো আলফ্রেদো কার্তোফোলি দ্য মিলানো
ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি...
হুউউশ
অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, তাই স্পিড বাড়াচ্ছি !
বাবা রে, এর হাতেই না মারা পড়ি !
ওই সেই গাড়ি !
এবারে ওদের ধরব !
লেভেল-ক্রসিংয়ের গেট যে বন্ধ হচ্ছে !
ঝড়াং
ঝড়াং
এবারে আমার হার্ট-অ্যাটাক হবে !
ওভারটেক করে আটকে দিয়েছি !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

গত এক-দেড়মাস ধরে সত্যি যেন অন্য কোনো আলোচনায় রুচি ছিল না কারো। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর অমন আকস্মিক এবং মর্মান্তিক জীবনাবসান, চাচা নেহরুর জন্মদিন, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন, নতুন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ—একটা-না-একটা বিষয় রোজই নেহরু-পরিবারকে যেন খুব অন্তরঙ্গভাবে চিনিয়ে দিচ্ছিল।

আমাকে তো ছোট্‌কা এক-দেড় মাসে অনেক গল্প শোনাল। বিগত শিশুদিবসে ছোট্‌কাকে আবার একটা ভাষণও দিতে হয়েছিল। আমাদেরই পাড়ায় ছোটদের একটা স্কুলে। ছোট্‌কা সেখানে অনেক চিঠি শোনাল। সেইসব চিঠি জওহরলাল নেহরুর লেখা, ছোট্ট কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে। অনেক গল্প বলল, নেহরুর নিজের জীবনের—ছোটবেলার গল্প। কী সুন্দর সেসব চিঠি, কী মজার সেসব ঘটনা। তোমরাও নিশ্চয়ই সেসব চিঠি পড়েছ। না পড়লে অবশ্যই পড়ে নেবে। পড়ে নেবে নেহরুর জীবনীও।

এবারের নতুন ধাঁধাগুলোও ছোট্‌কা একটু অন্যভাবে তৈরি করেছে। কীভাবে, সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

আসলে, এই ধাঁধার মধ্য দিয়েই নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাব আমরা।

প্রথম ধাঁধা ॥ জওহরলাল নেহরুর খুব প্রিয়জনের জন্ম ১৮৬১ সালের ৬ মে।

নীচে তিনজনের নাম দেওয়া হল। সঠিক নামটি বলো—

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) মহাত্মা গান্ধী (৩) মতিলাল নেহরু।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও—

স্বরূপরানী নেহরু জওহরলাল নেহরুর মায়ের —।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

প্রি দ য় ন্দি ই র্শি রা নী

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৯৭ শতাংশের অর্ধেক যদি দুটো করে বালা পরেন, আর বাকি অর্ধেক যদি একটাও বালা না পরেন, তাহলে গড়ে প্রত্যেকে একটা বালা পরেন। বাকি তিন-শতাংশও তো তাই। সুতরাং মোট ৮০০ বালাই পরেন ওই গ্রামের মহিলারা। (২) STRENGTH। (৩) মঙ্গলাচরণ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
৭		■		■	৮	
	■	৯			■	
১০	১১	■		■	১২	
১৩		■			১৪	
■	১৫		■	১৬		■

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা যে-জায়গাটির নামে বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। (৩) কোন্ পাত্রের নামে পত্রও আছে? (৫) কলকাতা কী? (৭) সুতো ধারালো করে। (৮) চেতনা। (৯) কোন্ বাদ্যে দাদাও আছে মামাও আছে। (১০) ব্রাহ্মণ। (১২) জামাবিশেষ। (১৩) ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। (১৪) দাতা যা করেন। (১৫) লুঠেরা। (১৬) শূন্যস্থান পূরণ করো : কুঁচবরন রাজকন্যা —বরন চুল।

উপর-নীচ : (১) কোন্ যুদ্ধের ভয়ে মানুষ ভীত? (২) নীরবতা। (৩) হাতি। (৪) ঈশ্বর কী? (৬) রামায়ণোক্ত পর্বত। (১১) মলাট। (১২) গ্রীষ্ম।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

প	ঞ্জ	র	■	ক	স	ম
হ্ল	■	বি	দি	শা	■	হি
ব	সু	■	ল	■	অ	মা
■	প্রি	য়	দ	র্শি	নী	■
জ	য়	■	রি	■	ক	চ
ল্লা	■	প্র	য়া	গ	■	র
দ	র	জা	■	তি	ল	কা

মজার খেলা

গতবার যে-মজার খেলাটা শিখেছিলাম আমরা, এবারের খেলাটাও তারই কাছাকাছি। তবে কিনা, দশটা কাঠির বদলে লাগবে এগারোটা দেশলাই-কাঠি বা টুথপিক। অঙ্কটাও হবে অন্যরকম।

এগারোটা কাঠি দিয়ে নীচে দেখানো অঙ্কের মতো একটা ভুল অঙ্ক সাজিয়ে দাও বন্ধুদের চোখের সামনে—

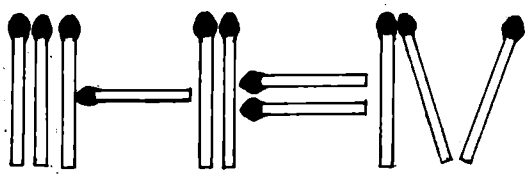

রোমান হরফে লেখা, ৩−২=৪। সত্যি তো আর তা হয় না। তাই বন্ধুদের কী করতে হবে, শোনো।

এর মধ্য থেকে যে-কোনো একটা কাঠিকে তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে তারা বসাবে যে, একটা ঠিক-ঠিক অঙ্ক তৈরি হবে টেবিলের ওপর।

বন্ধুরা চেষ্টা করুক। তার আগে তুমি নিজেও চেষ্টা করো।

আসলে এটা মোটেও শক্ত কিছু ব্যাপার নয়। বিশেষ করে গতবার যারা শিখে নিয়েছে মজার খেলাটা, তাদের কাছে তো জলের মতো সহজ। তারা কী করবে বলো তো? তারা করবে এইরকম—

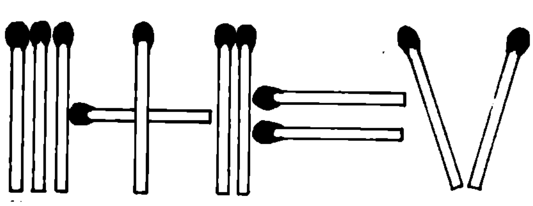

কী, এই অঙ্কটা ঠিক-ঠিক অঙ্ক তো?

মজারু

হাসিখুশি

"আমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে। তিনজনকে সমানভাবে দিতে হবে। কী করা যায় বলুন তো?"

"টাকাটা আমাকে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

"অমলবাবু আজ তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বিরিয়ানি খাইয়েছেন। তুমি কিছু খাওয়াবে নাকি?"

"একশোবার। হজমের ট্যাবলেটগুলো না হলে কে খাবে?"

"একটা বন্দুক কোথায় পাই বলতে পারো?"

"কেন, বন্দুক দিয়ে কী করবে?"

"তোমার গান শুনে মনে হল, এ সময় একটা বন্দুক হাতে থাকলে ভাল হত।"

"ঠাট্টা করছ আমাকে? দেখবে, একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কতগুলো গেট পেরোতে হয়।"

"তখন জেলে থাকবে বুঝি?"

"আজ স্কুলে কী কী শিখলে তাতান?"

"শিখলাম, তুমি যে অঙ্কগুলো কষে দিয়েছিলে, তার সবগুলোই ভুল।"

"আচ্ছা অজয়বাবু, আমাদের পূর্বপুরুষরা কি সত্যিই বাঁদর ছিল?"

"নিজের সম্পর্কে এত খারাপ ধারণা কেন আপনার?"

"ক'দিনই স্বপ্ন দেখছি আমি শিকারি বাজপাখি হয়ে গেছি। কী করব বলুন তো ডাক্তারবাবু?"

"বাড়ির ছাদে উঠে ওড়া অভ্যাস করুন।"

"ডাক্তারবাবু, আমার পাওনাদারের কলেরা হয়েছে।"

"আমাকে সারাতে হবে তো?"

"যাতে না সারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

তিনটি সাপের ছানা

প্রণব মুখোপাধ্যায়

'আয় তো রে কাল-কেউটে ছানা !'
বলল দিয়ে তুড়ি
জাত সাপুড়ে আপ্পুয়ানা ।
অমনি ঠেলে ঝুড়ি
হিসহিসিয়ে উঠল দুলে
তিনটি কচি ফণা,
গড় দেউলে কর্মভুলে
জুটল কয়েকজনা ।
আপ্পুয়ানা বাঁশির সুরে
সাপ কটিকে নাচায়,
পিলপিলিয়ে কাছে-দূরের
যতেক কচি-কাঁচায়
ভিড় জমাল, রঙ্গভরে
মানুষ সারি-সারি
ছুট্টে এল, দেউলগড়ে
ফুর্তি জমে ভারী !

হঠাৎ সে এক কেউটে বিশাল
মেঝের ফাটল ফেঁড়ে
লকলকে জিভ, একরোখা চাল,
উঠল ফুঁসে তেড়ে !
বাপ রে এ কী কাণ্ডখানা
কেউটে যে আগ্রাসী !
তিন লাফে তো আপ্পুয়ানা
পালায় ফেলে বাঁশি ।
ফোঁসফোঁসানি কেউটে বলে,
'এ কোন্ জারিজুরি,
প্যানপ্যানানি সুরের ছলে
বাচ্ছা হল চুরি !
ঢের হয়েছে নাচা-কোঁদা
দুষ্টু ছেলে ওরে,
চাখ্‌বি তো আয় টাটকা সোঁদা
ব্যাঙ রেখেছি ধরে ।'

লোক পালাল, হায় কী জ্বালা !
জমল না আর কিছু,
তিনটি সাপের ছানা পালায়
মায়ের পিছু-পিছু ।

ছবি : দেবাশিস দেব

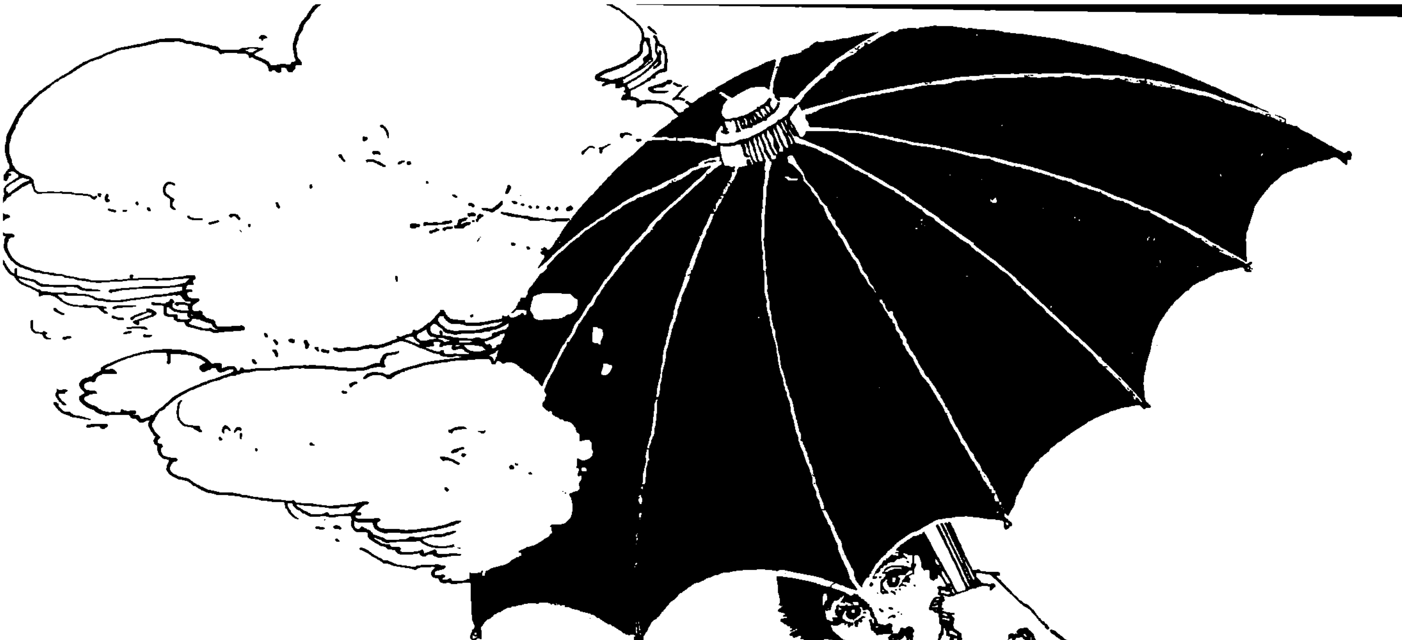

বাবার অদ্ভুত ছাতা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বিকেলে মিজোরাম থেকে একটা ছাতা আনিয়েছেন মিঠুয়ার বাবা। ছাতাটা সাবেকি আমলের মতো নয়। নতুন ধরনের। বিদেশী, অটোম্যাটিক। ইলেকট্রিকের সুইচের মতো একটা সুইচ আছে। সেটা টিপলে কী এক কায়দায় ঝট করে খুলে যায় ছাতা। ছাতা নয় তো, কায়দা-কানুন অনেকটা বন্দুকের মতো। ছাতাটার ট্রিগার টিপলে বন্দুকের মতো শব্দ করে যেভাবে ছাতা খুলে যায়, তাতে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বাঘ-সিংহও নির্ঘাত ভিরমি খাবে।

প্রথমবার বাবা যখন সুইচ টিপে ছাতাটা খুলেছিলেন, তখন খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল মিঠুয়া। অল্প-অল্প ভয়ও করছিল। কিন্তু দু'চারবার দেখবার পর ভয়টা উবে গেছে আস্তে আস্তে। খুব ইচ্ছে করছিল মিঠুয়ার, বাবার কাছ থেকে ছাতাটা চেয়ে নিয়ে নিজেও সুইচ টিপে ছাতাটা খোলে। কিন্তু বাবার গম্ভীর মুখ দেখে ছাতাটা চাইতে সাহস হল না।

সত্যি বলতে কী, বাবার কাছ থেকে আর-কিছু চাইবার সাহস নেই মিঠুয়ার। মিঠুয়াকে নতুন ছাতার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবা ধমকের সুরে বলেছেন, "খবরদার, এই ছাতায় হাত দেবে না একদম। গত এক বছরে নষ্ট করেছ অনেক কিছু। আর যদি দেখি..."

বাবা কথা শেষ না করলেও মিঠুয়ার বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না, এবার ছাতার কিছু গণ্ডগোল হলে মিঠুয়ার পিঠেই ছাতার শক্ত বাঁট ভাঙবেন বাবা। তাই বাবার দিকে না তাকিয়ে মনে মনে বলে মিঠুয়া, 'বা রে, যা-কিছু ভাঙে তার জন্যে বুঝি কেবল মিঠুয়াই দায়ী। কে যেন বলেছে, যত দোষ নন্দ ঘোষ। এ বাড়িতেও ঠিক তাই। যা কিছু নষ্ট হবে, তার জন্য সবাই দায়ী করবে মিঠুয়াকেই।'

সেবার পুজোর সময় বাবা যে নতুন ট্রানজিস্টরটা এনেছিলেন, সেটা তো মিঠুয়া হাতে নিয়েছিল সকলের পরে। সেদিন বাবা মা দিদি সবাই মিলে ট্রানজিস্টরে যত রাজ্যের আগড়ুম বাগড়ুম স্টেশন ধরে গানটান শুনল রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত। তারপর ট্রানজিস্টর থেকে যখন শুধু চিনা ভাষায় বক্তৃতা বেরোতে শুরু করল, তখন ট্রানজিস্টর বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! অবশ্য এসব ব্যাপার-স্যাপার মিঠুয়া নিজের চোখে দেখেনি, কেননা তার অনেক আগেই টানজিস্টরে হাত দিতে না পারার রাগে অপমানে দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছিল মিঠুয়া। ট্রানজিস্টর নিয়ে বাবার এতসব কসরতের কথা মিঠুয়া পরে শুনেছে দিদির কাছে। কিন্তু পরের দিন ভোরে সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে ট্রানজিস্টরে স্টেশন ধরবার চেষ্টা করতেই একটা নব্ খুলে বেরিয়ে এল। আর এমনই বরাত মিঠুয়ার, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুম থেকে উঠে বাবা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সে এক ভয়ংকর অবর্ণনীয় দৃশ্য। সোফায় মিঠুয়ার কোলে নতুন ট্রানজিস্টর, আর হাতে ভাঙা নব্। শুধু এক মুহূর্তের ব্যবধান। তারপর আর কিছু বোঝবার আগেই একটা বিরাট চড় নেমে এল মিঠুয়ার গালে।

চড় খেয়ে মিঠুয়ার চোখে জল ভরে এল, যতটা না চড়ের জন্য, তার চেয়েও অনেক বেশি অপমানে। আশ্চর্য! চড় মারবার আগে একবারও ভেবে দেখলেন না বাবা, ট্রানজিস্টরের নব্ ভেঙে বেরিয়ে আসবার জন্য সত্যি-সত্যিই কে দায়ী। কাল রাতে এত বেশি নাড়াচাড়া হয়েছিল যে, নবটা

হয়তো তখনই ভেঙে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, দোকানদারই বোধহয় ভাঙা নবওলা ট্রানজিস্টর গছিয়ে দিয়েছে।

শুধু ট্রানজিস্টর নয়, নতুন চিনামাটির ফুলদানি, টর্চ, আয়না এ-বাড়িতে যাই ভাঙুক না কেন, তার জন্য দায়ী হতে হবে মিঠুয়াকে। এটাই নিয়ম হয়ে গেছে। তাই আজ যখন বাবা নতুন-কেনা অটোম্যাটিক ছাতাটা সুইচ টিপে বারবার খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন, তখন অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও একবারের জন্যও সে বাবার কাছ থেকে চাইতে পারল না ছাতাটা।

ওর দিকে তাকিয়ে একবারও দয়া হল না বাবার। তার বদলে গম্ভীর মুখে বললেন, "যাও মিঠুয়া, পড়তে বোসো গিয়ে। কাল না তোমার ভূগোল পরীক্ষা?"

শিলংয়ের সেনট্রাল স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র মিঠুয়া। ইংরেজি, ইতিহাস আর অঙ্ক পরীক্ষা হয়ে গেছে। আগামীকাল ভূগোল পরীক্ষা। অথচ তেমন কিছু তৈরি হয়নি। ওর সবচেয়ে ভয় ভূগোলে। অনেক মুখস্থ-টুখস্থ করেও এদিককার নদী পাহাড় শহরের নাম কিছুতেই মনে থাকছে না।

"কী মিঠুয়া, তখন থেকে তো খালি ঘুরে বেড়াচ্ছ। যাও, যাও, শিগগির পড়তে বসো। ছাতাটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

বাবার কাছ থেকে আবার ধমক খেয়ে পড়তে বসে মিঠুয়া। ওর সামনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বড় ম্যাপখানা খোলা। এই ম্যাপটা কিছুদিন আগে শিলংয়ের সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিস থেকে কিনে দিয়েছেন বাবা। সেটাই ভাল করে দেখছে মিঠুয়া। কারণ ভূগোলের মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন, এবার পরীক্ষায় একটা ম্যাপ দেওয়া হবে। তাতে চিনে চিনে নদী পাহাড় শহরের নাম বসাতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তরটা ঠিকঠাক করতে পারলে আর কিছু না হোক, অন্তত পাশমার্কটা উঠে আসবে সহজেই।

নতুন ঝকঝকে সাদা কাগজে ছাপা মানচিত্র। তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নীল কালিতে ছাপা ব্রহ্মপুত্র নদী। তার কত উপনদী, শাখানদী। তাছাড়া নদীটাও কী বিরাট। জন্ম তিব্বতের কোন্ মুলুকে।

তবে সেখানে নাম ব্রহ্মপুত্র নয়, সাংপো। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে অরুণাচল প্রদেশ। তার নতুন রাজধানী ইটানগর। অরুণাচল প্রদেশে কত পাহাড়। ডাফলা, মিরি, আবর, মিশমি কত নাম এদের। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে দিসপুর। আসামের অস্থায়ী রাজধানী। সেখান থেকে একটা রাস্তা সোজা উঠে গেছে দক্ষিণের মালভূমিতে। এই তো শিলং। মেঘালয়ের রাজধানী। ওর নিজের শহর।

এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হঠাৎ ম্যাপের কাগজ থেকে শিলং শহর যেন উঠে এল বাইরে। মিঠুয়া এভাবে আর কখনোই শিলংকে দেখেনি। ওর মনে হল, ও যেন আকাশ থেকে নীচে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পাইনগাছে-ছাওয়া মনোরম শিলং শহরকে। কিন্তু এ কী অদ্ভুত ব্যাপার। ও যেন শূন্যে হালকা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে পুবদিকে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। ওপরে ঘন নীল আকাশ, পায়ের নীচে টিয়াপাখির মতো সবুজ খাসি পাহাড়। হাওয়ার ডানায় উড়তে উড়তে একসময় সে খাসি পাহাড় পেরিয়ে গেল।

নীল আকাশে উড়ে যেতে-যেতে অল্প ভয় করছে ওর। কী কায়দায় যে ও আকাশে উড়ছে তা কে জানে। একবার ভয়ে ভয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে মাথার ওপরে বাবার সেই আশ্চর্য অটোম্যাটিক ছাতা, মিঠুয়ার হাতে ধরা ছাতার হ্যাণ্ডেল। পায়ের নীচে ছবির মতো নদী পাহাড় গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে। কী অবাক কাণ্ড! যেসব নদীটদিগুলো এতদিন ছিল কেবল ম্যাপের পাতায়, এখন সেগুলি দেখতে পাচ্ছে নিজের চোখে। ওই তো কোপিলি নদী। বাঁ পাশে ওটা আবার কী! আরে, ওই তো ম্যাপের গায়ে লেখা আছে জায়গাটার নাম। এটাই তা হলে মিকির পাহাড়। বেশ উঁচু উঁচু পাহাড় চারদিকে। শুধু পাহাড় নয়, ঘন জঙ্গল সারা অঞ্চল জুড়ে। বড়-বড় গাছপালা এমনভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে যে, তা দেখে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসে। মিঠুয়ার মনে পড়ল, বইয়ে পড়েছিল, এই জঙ্গলে প্রচুর বুনো হাতি। সত্যিই তো! হঠাৎ ও নীচে দেখতে পায় এক জায়গায় একপাল বুনো হাতি জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। চিড়িয়াখানার পোষ-মানা হাতি নয়, রীতিমত জংলি বুনো হাতি। কালো মেঘের মতো চেহারা দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

কিন্তু এ কী, ছাতাটা আগের মতো আর উড়তে পারছে না কেন? ক্রমেই যেন ছাতাসুদ্ধ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে মিঠুয়া। আর নামবি তো নাম, নামছে একেবারে বুনো হাতির পালের রাজ্যে। ভয়ে মিঠুয়ার কপালে ঘাম জমতে শুরু করে। হাত থেকে ছাতার হ্যাণ্ডেল যেন পিছলে যেতে চায়। তাই অসহায়ভাবে কোনোরকমে ছাতার হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে আবার ওপরের দিকে উঠতে পারে ছাতার সঙ্গে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ। খামখেয়ালি ছাতার এখন ওড়ার নেশা কেটে গেছে। জেদি দামাল ছেলের মতো ছাতাটা শুধু নামছে আর নামছে। আর একটু হলেই বুনো হাতির পালের ঠিক মাঝখানে নেমে পড়বে মিঠুয়া। তারপর যে কী হবে, ভাবতে গিয়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে ও। নিরুপায় হয়ে শরীরের সব শক্তি দিয়ে জাপটে ধরে একমাত্র আশ্রয় এই আশ্চর্য ছাতাকে। কিন্তু মিঠুয়ার হাতের চাপে সেই মুহূর্তে পট করে ভেঙে গেল বাবার সেই আনকোরা নতুন সুন্দর ছাতা। সঙ্গে সঙ্গে আবার চিৎকার করে ওঠে মিঠুয়া। তবে এবার বুনো হাতির ভয়ে নয়। নতুন ছাতা ভাঙার অপরাধে বাবার হাতে মার খাওয়ার ভয়ে।

প্রচণ্ড ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মিঠুয়া, "বাবা, মেরো না আমাকে। আমি ছাতা ভাঙিনি!"

আর ঠিক তক্ষুনি ঘুম ভেঙে যায়। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখে মিঠুয়া, কোথায় মিকির পাহাড়ের জঙ্গল, হাতি। নিজেদের বাড়িতে খাটের ওপর ছড়ানো ভূগোল, ম্যাপ, বইখাতার মধ্যে শুয়ে আছে ও। সামনে দিদি পরমা দাঁড়িয়ে। "কী রে, কী সব আবোল-তাবোল বকছিস ঘুমের মধ্যে?"

চারদিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পায় মিঠুয়া ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে বাবার সেই অটোম্যাটিক ছাতা। ভাঙা তো দূরের কথা, সামান্য টালও খায়নি।

বুক-ভরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিঠুয়া ভাবে, যাক্, ছাতা ভাঙার অপরাধে বাবার হাতে আর এখন মার খেতে হবে না।

ছবি : অনুপ রায়

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেকরকম বাগান করেছিলেন, কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও! এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোনোই সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে পুকুরধারে এসে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল, তারপর আর দিপু ফিরে এল না। এদিকে দিপু-ইরানির কোনো খবর না পেয়ে কলকাতায় ওদের বাবা-মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দিপুর বাবা অসুস্থ, তবু সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু আর একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে রওনা হলেন বর্ধমানের দিকে। তারপর···

থানার বড়বাবু ইরানিকে দেখে বলে উঠলেন, "এই যে দিদিমণি, এসো, এসো! তোমার ভাইটি কোথায় গেল? সে আসেনি?"

থানায় ঢুকে বড়বাবুর সামনে ট্রেনের সেই লোকটাকে দেখে ইরানি এমনই অবাক হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় সে কোনো কথাই বলতে পারল না। লোকটি নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট টানছে। তার সামনে টেবিলের ওপর এক কাপ চা। দারোগাবাবু ওই লোকটাকে খাতির করে চা খাওয়াচ্ছেন? অথচ ইরানির নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, ওই লোকটা একটা ডাকাত। ও ট্রেনের খুদে ডাকাতদের জব্দ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ও চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

ইরানি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বড়বাবু আবার বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভাই, বোসো! এই তো চেয়ার আছে—।"

একজন কনস্টেবল একটা চেয়ার টেনে এনে দিল টেবিলের পাশে। কিন্তু ইরানি ট্রেনের লোকটার পাশে বসতে মোটেই রাজি নয়। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতন মিটিমিটি হাসছে।

ইরানি বলল, "আমার ভাই···"

কথাটা শেষ করতে পারল না, হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ জ্বালা করে উঠেছে, গলার কাছে কেমন যেন একতাল বাষ্প জমা হয়েছে। কিন্তু ইরানি কিছুতেই কাঁদবে না এইসব লোকজনের সামনে। মেয়ে হলেই যে দুর্বল হতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু দিপু···দিপুটা হঠাৎ কোথায় চলে গেল···দিপুর যদি কোনো ক্ষতি হয় তা হলে মা-বাবাকে সে কী বলবে।

কান্নাটা চাপা দিতেই রাগ এসে গেল ইরানির। সে সোজা দারোগাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, "আপনার···আপনারা এখানে থানা খুলে বসেছেন···আরাম করে চা খাচ্ছেন, আর এদিকে যে কত বিপদ ঘটে যাচ্ছে তার কোনো খবরই রাখেন না!"

বড়বাবু অবাক হয়ে ভুরু ও গোঁপ একসঙ্গে নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী! আবার কী বিপদ হল? তোমার জ্যোঠামশাইয়ের খোঁজ করবার জন্য কাছাকাছি কয়েকটা থানায় খবর পাঠিয়েছি!"

দারোগাবাবুর টেবিলের ওপর টেলিফোন দেখে ইরানি বলল, "আমি এক্ষুনি কলকাতায় ফোন করতে চাই!"

বড়বাবু একগাল হেসে বললেন, "ওটা যে মরে গেছে দিদিমণি! মাঝে-মাঝেই ভাবি, ওটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখব! ওটার কথা ছাড়ো, আবার কী নতুন বিপদ হল বলো দেখি?"

ইরানি বলতে গেল, আমার ভাই···

আবার সে থেমে গেল। দিপু যদি এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে? মধু কিংবা কেষ্ট সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেবে বলেছিল।

ট্রেনের সেই লোকটা এবারে চেয়ার ঘুরিয়ে ইরানির দিকে পুরোপুরি ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাই···ট্রেনে যাকে দেখেছিলুম? সে তো খুব স্মার্ট ছেলে, কী হয়েছে তার? হারিয়ে গেছে?"

ইরানি দারোগাবাবুর দিকে চেয়েই বলল, "কাল রাত থেকে তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বড়বাবু বললেন, "রাত থেকে মানে? কত রাত থেকে? সন্ধেবেলাতেই তো আমি দেখে এলাম। এ-গ্রামে কি মানুষ চুরির ধুম পড়ে গেল? আড়াই বছর এখানে পোস্টিং হয়ে গেল, কোনোদিন এমন কাণ্ড দেখিনি!"

ট্রেনের লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, সব খুলে বলো তো।"

ইরানি প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? আপনাকে আমি বলতে যাব কেন?"

লোকটি বলল, "আমার নাম খয়েরলাল। ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট, আর কিছু জানার দরকার নেই। তুমি দারোগাবাবুকেই সব কথা বলো। আমিও শুনি।"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি খয়েরলালের সামনে সব বলতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই।"

ইরানি কোনো মানুষের এমন অদ্ভুত নাম শোনেনি। খয়েরলাল? লোকটা খুব পান খায়। হাওড়া স্টেশনে যখন লোকটাকে প্রথম দেখে, তখনও ঘ্যাস-ঘ্যাস করে পান চিবুচ্ছিল।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দিদিমণি, তোমার ভাইকেও চুরি করে নিয়ে গেল কী করে? তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

ইরানি এবারে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়ল, তার পা কাঁপছে। যতবারই দিপুর কথা মনে পড়ছে ততবারই ধক-ধক করে উঠছে তার বুক।

মুখ নিচু করে ইরানি আস্তে আস্তে বলল, "রাত্তিরবেলা আমরা এক ঘরেই শুয়েছিলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কেউ দরজা ভাঙেনি। দিপু নিজেই একসময় উঠে

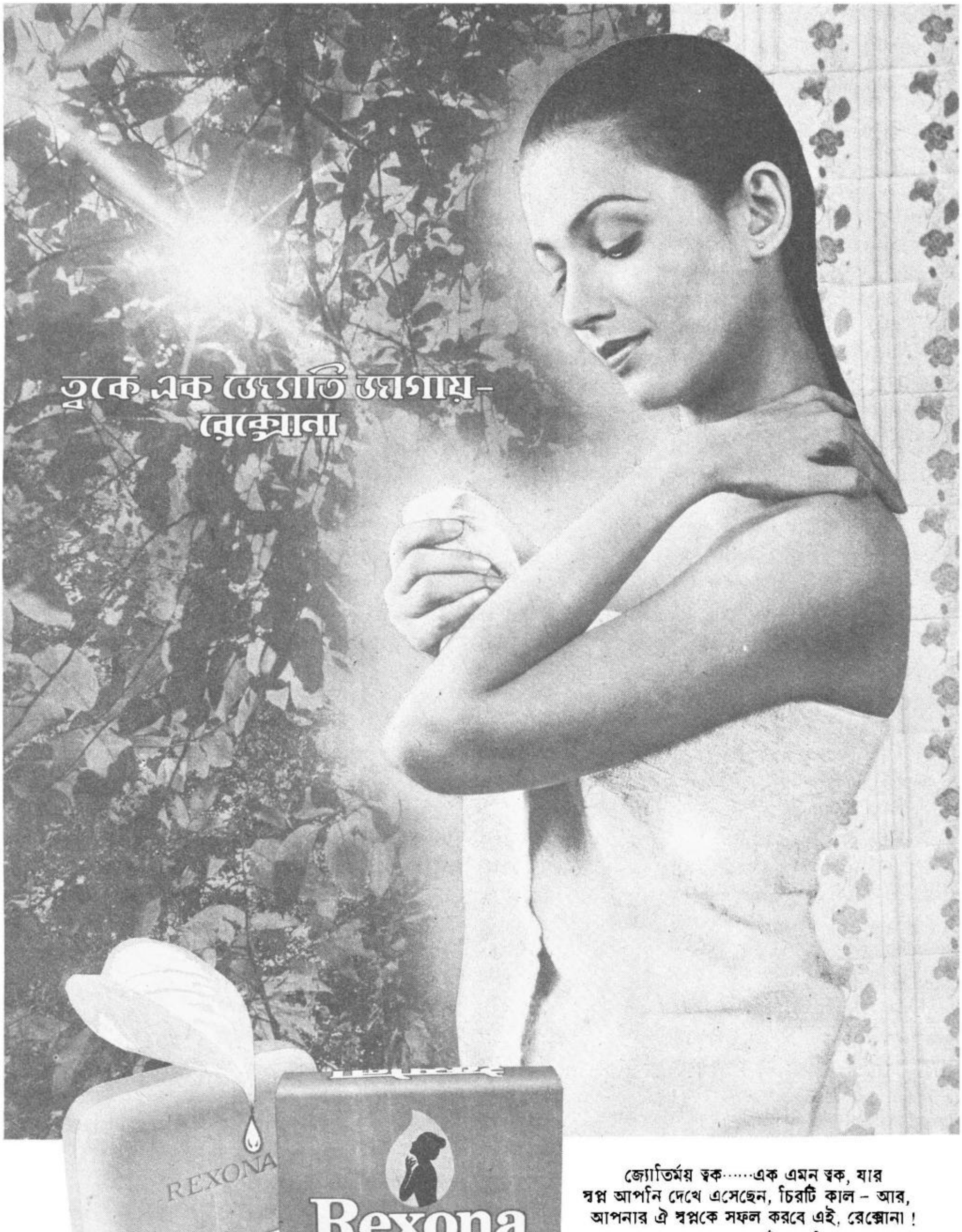

জ্যোতির্ময় ত্বক······এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

গিয়েছিল বাইরে। তারপর আর…"

"ফেরেনি ? সকালবেলা ভাল করে খুঁজে দেখেছিলে ?"

"আমাকে কিছু না-বলে তো ও কোথথাও যাবে না ?"

"মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে নিজে-নিজে বেরিয়ে গেল… নিশির ডাক নয় তো ? এদিকে শ্মশানের কাছে এক কাপালিক থাকে…"

বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাইয়ের নাম দিপু ? পুরো নাম কী ?"

ইরানি বলল, "দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ক্লাস নাইনে পড়ে।"

"ওর কি প্রজাপতি ধরার শখ আছে ?"

"প্রজাপতি ধরা ? তার মানে ?"

"অনেক ছেলে প্রজাপতি খুব ভালবাসে। বড় প্রজাপতি দেখলে ধরতে যায়। প্রজাপতি ধরা কিন্তু খুব শক্ত। প্রজাপতির পেছনে ছুটতে-ছুটতে হয়তো তোমার ভাই মাঠের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে।"

"রাত্তিরবেলা প্রজাপতি ধরতে যাবে ?"

"রাত্তিরে কেন, ভোরবেলা বেরুতে পারে। ঠিক কখন যে ঘর থেকে বেরিয়েছে, তা কি কেউ জানে ?"

"আমাদের ঘরের সামনেই বারান্দায় একটা বাচ্ছা ছেলে শোয়। সে খুব সকালে উঠেছে। সে দেখেছে দরজা খোলা।"

বড়বাবু বললেন, "তুমি একলা-একলা থানায় খবর দিতে এসেছ ? তুমি এই গ্রামে নতুন…তোমার সঙ্গে কেউ আসেনি ?"

ইরানি চুপ করে রইল।

"তোমাদের ওখানে রান্নার কাজ করে যে লোকটা, কী যেন নাম ? খুব চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে ! তাকে যে আজ সকালে থানায় আসতে বলেছিলাম, সে এল না ?"

ইরানি দু' দিকে মাথা নাড়ল।

বড়বাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, "কেন এল না সে ? আমি তাকে হুকুম দিয়ে এসেছি।"

তারপর তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "দরওয়াজা !"

একজন কনস্টেবল বাইরে থেকে এসে ঠকাস করে জুতোর শব্দ করে স্যালুট দিল। তারপর বলল, "স্যার ?"

বড়বাবু বললেন, "রামবাবুর বাগানে যে লোকটা রান্না করে, চেনো তাকে ? কী নাম তার ?"

কনস্টেবল বলল, "এককড়ি সাধু স্যার।"

"যাও, এক্ষুনি তাকে নিয়ে এসো ! মুখের কথায় আসতে না চায় তো ধরে নিয়ে এসো !"

"যো হুকুম, স্যার !"

ইরানি বলল, "সে ওখানে নেই।"

বড়বাবু বোমার মতন ফেটে পড়ে বললেন, "নেই ? এককড়ি ওখানে নেই ? কোথায় গেছে ? আমি তাকে থানায় আসতে বলেছিলুম…"

ইরানি বলল, "আজ সকালে সে চলে গেছে। সে থানা পছন্দ করে না !"

"পালিয়েছে ? ব্যাটা পালিয়েছে ? এতবড় সাহস ? ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ছেলে-ধরা দলের যোগ আছে। দরওয়াজা ! ছুটে যাও, যেমন করে পারো ওকে ধরে আনো, এর মধ্যে বেশিদূর যেতে পারবে না।"

ইরানি বলল, "এখান থেকে কলকাতায় খবর দেবার কোনো উপায় নেই ?"

বড়বাবু বললেন, "একটাই উপায় আছে। বাসে করে মেমারি চলে যাওয়া। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়া। তারপর লঞ্চে চেপে কলকাতায় পৌঁছে যাকে যেমন খুশি খবর দিতে পারো।"

ইরানি বলল, "আমার ভাইকে এখানে ফেলে রেখে, মানে কোথায় সে গেছে তা না-জেনে আমি কলকাতায় চলে যাব ?"

খয়েরলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। চলুন বড়বাবু, আমরা আগে একবার অকুস্থলটা দেখে আসি। ক্লাস নাইনে পড়া একটি স্মার্ট, কলকাতার ছেলে তো গ্রামে এসে এমনি-এমনি হারিয়ে যেতে পারে না !"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, চলুন, একবার অন দা স্পট এনকোয়ারি করে আসি !"

খয়েরলাল বলল, "তার আগে একটা প্রশ্ন, আপনি নিশি-ডাকের কথা কী বলছিলেন ?"

বড়বাবু বললেন, "নিশির ডাক কাকে বলে জানেন না ? এক একজন তান্ত্রিক যোগী আছে, তারা মাঝরাতে কোনো ছেলের নাম ধরে তিনবার ডাকে। অমনি সেই ছেলে ঘুমের ঘোরে বাইরে বেরিয়ে যায়। যোগীরা ধরে নিয়ে চলে যায় তাদের।"

"তারপর ?"

"তারপর মানে ?"

"যোগীরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে ?"

"সে-সব আমি জানি না। শুনেছি যোগীরা কোনো ছেলেকে এরকম ডেকে নিয়ে গেলে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না !"

বড়বাবু হঠাৎ ইরানির দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "না, না, মাঝে-মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়, সবাই হারিয়ে যায় না। আমরা পুলিশরা ওসব যোগী-টোগিদের গ্রাহ্য করি না ! একবার ক্যাঁক করে ধরতে পারলে গারদে ভরে দেব। একবার হয়েছিল কী জানো, আমি তখন মেদিনীপুরে … একজন সাধু সেখানে … "

খয়েরলাল বলল, "আপনার গল্পটা পরে শুনব। এখন চলুন যাওয়া যাক। আগে বাগানটা দেখে আসি। তারপর নদীর ধারে শ্মশানে কোন্ সাধু এসেছে তার কাছেও একবার যাওয়া যাবে।"

ইরানির দিকে ফিরে খয়েরলাল বলল, "সেই যে ট্রেনে তোমাকে বলেছিলুম না, আবার দেখা হবে ? তখন কিছু ভেবে বলিনি। কিন্তু সত্যি-সত্যি আবার দেখা হয়ে গেল। তোমার ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে নিশ্চয়ই !" (ক্রমশ)

রোভার্সের রয়
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোভার্স বনাম মেলবরোর খেলা। মেলবরো এক গোলে এগিয়ে আছে। সমর্থকদের উত্তেজিত করছে, মেলবরোর কোচ জ্যাকসন···
রয়ের দল এক গোলে হারছে ! চেঁচাও সবাই !
ওয়ান-নিল !
ওয়ান-নিল !
উঃ, জ্যাকসন কী কাণ্ড করছে দ্যাখো !
কীরকম চেঁচাচ্ছে সবাই !
হুম !
আমাদের সমর্থকরা চুপ করে আছে কেন ?
তোমরা কি বোবা হয়ে গেছ ?
আরে !
রোভার্স ! রোভার্স !
চেঁচিয়ে কি গোল শোধ করা যাবে ?
মেলবরো আবার আক্রমণ চালিয়েছে ! রোভার্সকে চেপে ধরেছে তারা···
দু গোল চাই !
একটুর জন্যে হল না !
চার্লি বাঁচিয়েছে !
আবার গোলে বল এসেছিল !
উঃ !
এবারে বাঁচাল ম্যাকে !
রোভার্স আজ আরও গোল খাবে !

বাকি সময়ে কী হবে, তা কি কেউ জানে ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ট্রাভিসকে ছুটে আসতে দেখে টারজান বললেন, "আমি একাই পারব !"
দর্শকদের মধ্য থেকে একজন ছুটে এসে মুক্ত করল বন্দীকে। সে টিমারু। আর বন্দীর নাম রিমালু।
রিমালু জঙ্গলে পালাল। আর টিমারু ফের মিশে গেল দর্শকদের ভিড়ে।
টারজানের বিক্রম দেখে দর্শকরা অবাক ! কিন্তু... প্রাসাদের দিক থেকে আরও অনেক প্রহরী সেখানে ছুটে এল।
উমেদেমুর নির্দেশে তারা ঘিরে ফেলল টারজানকে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মড়ার উপর খাঁড়া

নবকুমার বসু

(শেষাংশ)

॥ ৪ ॥

প্রায় দুটো নাগাদ সোমদেব আর বুড়ো হিস্টোলজি প্র্যাকটিক্যাল সেরে বেরিয়ে এল। দুটোয় ডিসেকশন আরম্ভ। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কথা অনুযায়ী ওরা চলল অ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্টের ক্লার্ক রবিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

সকালবেলা ঝগড়ুকে ম্যানেজ করে ডিসেকশন হল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুড়ো কোনো কথা বলেনি। ক্যান্টিনে একটা কোণের টেবিলে বসে চা খেতে খেতে বুড়ো পরে জিজ্ঞেস করেছিল, "সোম, আর কী ক্লাস আছে রে পরে ?"

সোম বলেছিল, "বারোটা থেকে হিস্টোলজি প্র্যাকটিক্যাল। কেন বল তো ?"

বুড়ো বলেছিল, "ভাবছি আজকের মধ্যে আমরা আর কী-কী খবর জানতে পারি। ব্যাপারটা যেভাবে এগুচ্ছে—।"

সোমদেব বলেছিল, "বুড়ো, আগে আমাদের এখন পর্যন্ত ডেভেলাপমেণ্টটা একবার ভেবে নেওয়া দরকার।"

"ঠিক বলেছিস।" বুড়ো বলেছিল। "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি, তুই শোন।"

সোম তাড়াতাড়ি খাতা থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখতে যাচ্ছিল। কিন্তু বুড়ো বলেছিল, "খবর্দার সোম, কিচ্ছু লিখিস না। লেখা মানেই ডকুমেণ্ট তৈরি করা। সব মাথায় রাখতে হবে।"

সোমদেব একটু অপ্রতিভ হয়ে বলেছিল, "য়্যু আর রাইট।"

বুড়ো বলতে শুরু করেছিল, "এখন পর্যন্ত আমরা যা-যা জেনেছি—একটা ফিমেল বডিতে ডিসেকশন করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টালি তার স্টম্যাক থেকে আমরা একটা সোনার হার আর একটা মোহর খুঁজে পেয়েছি। বডিটা বঙ্গীয় সৎকার সমিতি কয়েক দিন আগে কোনো জায়গা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমরা কাগজের ডেসক্রিপশন অনুযায়ী বডিটা চিনতে পেরেছি। কিন্তু আমরা এবং সম্ভবত বঙ্গীয় সৎকার সমিতি কেউই এখনও বডির নাম-ধাম পরিচয় জানি না। রাইট ?"

"ইয়েস।" সোমদেব বলেছিল। "সেই সঙ্গে এই বডি বঙ্গীয় সৎকার সমিতিই আমাদের অ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্টকে দিয়েছে কি না, সেটাও আমরা জানি না। কেননা, বডি-রেজিস্টারে তার কোনো উল্লেখ নেই।"

"কারেক্ট।" বুড়ো বলেছিল। "আমাদের আর একটা ধারণা হয়েছে, পসিব্‌লি এইটা একটা মার্ডার হওয়া বডি, কেননা মাথার পিছনে ব্লান্ট ইনজুরি এবং কান দিয়ে ব্লিডিং অর্থাৎ ইনটারনাল হেমারেজ হয়ে মারা গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, তা ধরা যেতে পারে।"

বুড়ো বলেছিল, "এখন আমাদের তাহলে আর এগোনোর আগে কয়েকটা কাজ করতে হবে। প্রথমে আজকেই দুপুরে ডিসেকশনে যাওয়ার আগে আমরা রবিনবাবুর সঙ্গে দেখা করব। খুব স্যার-স্যার বলে ভাব করার চেষ্টা করব এবং কায়দা করে জেনে নেব বডি কে নিয়ে এল, কোত্থেকে নিয়ে এল এবং কে এসব হিসেবপত্র রাখে, দেখে। দু নম্বর হচ্ছে—আমরা বঙ্গীয় সৎকার সমিতির কাছে যাব। নিজেদের নাম-পরিচয় গোপন করে যদি পারি কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করব।"

সোমদেব বলেছিল, "ঠিক আছে, এই দুটো কাজই আমরা আজকে সেরে ফেলতে পারি।"

এই পর্যন্ত কথাবার্তা বলে ওরা ক্যান্টিন থেকে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল টেবিল টেনিস খেলতে। ঠিক ছিল ডিসেকশন হলে যাওয়ার আগে রবিনবাবুর কাছে যাবে।

বুড়ো মৌরি চিবুতে চিবুতে বলল, "সোম, তুই কথা আরম্ভ করবি। আসল কথা যেন কিছুই ফাঁস করে ফেলিস না।"

"তুই কিচ্ছু ভাবিস না।" সোম বলল।

ওরা দোতলার ডিসেকশন হলে ঢুকে পড়ল। সকালবেলার থেকে এখন ডিসেকশন হলের চেহারা অনেক আলাদা। বড়-বড় আলো জ্বলছে, এদিক-ওদিকে অনেকে ঘোরাফেরা করছে। দুজন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র অধ্যাপকের সঙ্গে কানের একটা মডেল নিয়ে ডিসকাস করছে। সোম আর বুড়ো হলের শেষদিকে রবিনবাবুর ঘরের দিকে চলে গেল। কাঠের দরজায় দুবার টোকা দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল। রবিনবাবুকে ঘরে দেখল না। ওরা বেরিয়ে এসেই পাশের ঘরে আর্টিস্ট বিশ্বনাথ করের ঘরে নক্‌ করল, যদি রবিনবাবুকে ওখানে পাওয়া যায়। ভিতর থেকে নস্যি-নেওয়া গলার আওয়াজ পেল, "কে? ভেতরে আসুন।"

রোগা, লম্বা, মাঝবয়সী লোক বিশ্বনাথ কর। ধুতি আর গুরু-পাঞ্জাবি পরে রয়েছেন। নাকের ডগায় চশমা। সামনে টেবিলের ওপর ড্রইং শিট, চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো অজস্র রঙ-তুলি, প্লেট-কাপ, পেন্সিল, প্যাস্টেল, ইরেজার, অ্যানাটমি বই, অ্যাশট্রে। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্র বুড়ো আর সোম দুজনেরই চোখ আটকে গেল আর্টিস্টবাবুর সামনেই টেবিলে পাতা ড্রইং শিটটার ওপর। বড় সাদা কাগজটার ওপর জ্বলজ্বলে প্যাস্টেল দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা কাটা স্টম্যাকের ছবি এত নিখুঁত যেন এক্ষুনি স্টম্যাকটা কেউ কেটে ওখানে রেখে দিয়েছে। বিশ্বনাথবাবু একটু নিচু হয়ে টেবিলের ড্রয়ারে কী যেন ঢুকিয়ে রাখছিলেন। ওরা হঠাৎ ঢোকাতে যেন সামান্য বিরক্ত। বললেন, "বলুন ভাই, কী ব্যাপার।"

সোমদেব একটু থতমত খেয়ে বলল, "অ্যাঁ, না। মানে আমরা একটু রবিনবাবুর খোঁজ করছিলাম। পাশের ঘরে নেই, তাই ভাবলাম যদি—"

"সরি ব্রাদার।" বিশ্বনাথ বললেন। "রবিনবাবু তো আজ আসেননি। আর এখনও যখন আসেননি—আজ আর আসবেন বলে মনে হয় না।"

"ওহ্ আচ্ছা।" সোম বলল। "কখন আসেন রবিনবাবু?"

"মোটামুটি সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ।" বিশ্বনাথবাবু ওদের সঙ্গে আর যেন কথা বলতে চাইছিলেন না।

হঠাৎ বুড়ো বলে উঠল, "ওহ্ কী দারুণ আঁকেন আপনি। একদম ওরিজিনাল!"

বিশ্বনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন বুড়োর দিকে। দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "তাই নাকি!"

তারপর একটু স্বাভাবিক গলা করে বললেন, "অভ্যেস আর কি। চাকরি তো।"

সোমদেব বলল, "কাটা জায়গাটাও এমন দেখাচ্ছে যেন এখনই কাটা হয়েছে।"

"আমি স্পেসিমেন সামনে রেখেই আঁকি।"

"সত্যি! আপনি বডি থেকে কাটা স্টম্যাক এখানে রেখে আঁকেন?" বুড়ো সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

বিশ্বনাথ বললেন, "তা না হলে মেজারমেন্ট ঠিক থাকবে কী করে!" এটুকু বলেই আর্টিস্টবাবু হাতে একটা তুলি টেনে নিলেন। যেন ছোট্ট একটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ওরা এবার চলে যাক। বুড়ো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা রবিনবাবু কোথায় থাকেন?"

"সুভাষগ্রাম। মনসাতলা।" বিশ্বনাথবাবু তুলি দিয়ে রঙ গুলতে শুরু করে দিলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "এসব খবর অফিসে জিজ্ঞেস করুন না।"

ওরা বুঝল আর্টিস্টবাবু ওদের কাটিয়ে দিতে চাইছেন। বুড়ো বলল, "থ্যাঙ্ক য়্যু। আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করলাম। চলি।"

বিশ্বনাথবাবু তেরছা চোখে তাকালেন। কিছু বললেন না। ওরা দুজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঘর থেকে বেরুতে গিয়েই দেখে বিশ্বনাথ করের ঘরের পাশেই এতক্ষণ যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন বডি আর ভিসেরার ইনচার্জ মথুরাবাবু। ওদের দেখেই বললেন, "আপনারা সাত নম্বর বডিতে ডিসেকশন করছেন?"

ভীষণ অবাক হয়ে বুড়ো বলল, "হ্যাঁ।"

মথুরাবাবু হাতে একটা কাগজ দেখতে দেখতে বললেন, "আপনারা কি অ্যাবডোমেন খুলে ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো!"

"মুশকিল হয়ে গেল তো বড়," মথুরাবাবু চিন্তান্বিত মুখে বললেন। "আর দুদিন পরে পেট কাটার কথা ছিল। বডি তো এখন আর ওলটাতে পারব না। এদিকে সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা নেক ডিসেকশনের জন্য বসে রয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ডাক্তার হোমচৌধুরীর সঙ্গে কথা বলব।"

মথুরাবাবু আর দাঁড়ালেন না। সোজা চলে গেলেন দরজার দিকে।

তিনতলার হলে যেতে যেতে সোমদেব বলল, "কী ব্যাপার বলো তো বুড়ো! আর্টিস্টবাবুর কথাবার্তা কেমন অস্বাভাবিক যেন। এদিকে মথুরাবাবু বডির পেট খুলে ফেলা হয়েছে কিনা খবর নিচ্ছেন। আমরা স্টম্যাকের—"

"সোম, কোনো আলোচনা এখানে নয়।" বুড়ো ওকে সাবধান করে দেওয়ার মতো কথার মাঝখানেই বলল। একটু থেমে আবার বলল, "হল থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে

বঙ্গীয় সৎকার সমিতির অফিসে যাব। আর আগামীকাল সকালে যাব সুভাষগ্রাম। কেননা রবিনবাবু যদি কালকেও না আসেন কিংবা শরীর খারাপ হয়ে থাকে, সে-ক্ষেত্রে শুধু-শুধু আমাদের সময় নষ্ট হবে। আমার ধারণা উনি পুরনো, এক্সপিরিয়েন্সড লোক। বডি কীভাবে আসে, কে এসব হিসেব রাখে এ সম্বন্ধে ভাল আইডিয়া দিতে পারবেন।"

সোম বলল, "ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি আমাদের কাজ সারতে হবে।"

বুড়ো বলল, "আর একটা কথা। সাইলেন্টলি আর্টিস্ট বিশ্বনাথ কর এবং মথুরাবাবুকে আমরা একটু ওয়াচ করব।"

॥ ৫ ॥

সতীশ পাল স্ট্রিটে বঙ্গীয় সৎকার সমিতির অফিসে বুড়ো আর সোমদেব যখন পৌঁছল, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট। বেলা ছোট হতে শুরু করেছে। রোদ্দুরের তেজ কম, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বুড়ো আগেই টেলিফোন অপারেটরের কাছ থেকে জেনে রেখেছিল সতীশ পাল স্ট্রিটটা কোথায় হবে। আঠারোর বি ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। লেক গার্ডেনসের এদিকটা মোটামুটি ফাঁকা। একটা মাঠ পেরিয়ে মাঝারি সাইজের একতলা পুরনো বাড়ি। তারপরেই শুরু হয়েছে কোনো ফ্যাক্টরির দেয়াল। ওরা সাইনবোর্ড দেখে এগিয়ে গেল।

বাড়িটা বেশ লম্বা। মাঝখানে অফিসে ঢোকার দরজা। আরও এগিয়ে বড় গেট, সেখান দিয়ে গাড়ি ভিতরে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে বোঝা যায়। সোম আর বুড়ো দরজা দিয়ে ঢুকল। বড় ঘর। গোটাকয়েক আলমারি টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চিতে প্রায় ভর্তি। টেবিলের ওপর প্রচুর খাতাপত্রের মাঝখানে বসে দুজন ভদ্রলোক কাজকর্ম করছেন। বেঞ্চিতে তিনজন বিহারি লোক বসে রয়েছেন চুপচাপ শুকনো মুখে। একজন দরোয়ান গোছের লোক ওদের কাছে এগিয়ে এল। "হাঁ, বলিয়ে বাবু।"

সোম বলল, "ইয়ে, মানে দরোয়ানজি, সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হবে?"

দরোয়ান সঙ্গে সঙ্গে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। বলল, "বৈঠিয়ে। হাঁ দেখা হোবে।"

ওরা একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। তারপর দরোয়ান চলে যেতেই বুড়ো হঠাৎ এমন একটা কাজ করল যাতে সোমদেব একদম হকচকিয়ে গেল। বুড়ো ওর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ভালছেলে মার্কা কালো ফ্রেমের চশমা বার করে টুক করে পরে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর চেহারাটা পুরো পাল্টে গেল। একটু নিচু গলায় সোমকে বলল, "আমার নাম পার্থ আর তুই কিশোর। এই নে, এটা গলায় জড়িয়ে নে। মাঝে মাঝে কাসবি।"

কথাগুলো বলেই বুড়ো সোমকে একটা কটকটে নীল রঙের মাফলার দিল। সোম তাড়াতাড়ি সেটা গলায় জড়িয়ে নিল। বুড়ো আবার বলল, "মনে হয় দরোয়ান অত খেয়াল করবে না।"

বুড়োর কথা শেষ হতেই দারোয়ান হাতে খইনি টিপতে-টিপতে এসে বলল, "যাইয়ে বাবু।" বলে হাত দিয়ে ভিতরের দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর উল্টো দিকে বেঞ্চিতে বসা তিনজনের কাছে চলে গেল। ওরা ঘরের মধ্যে দিয়েই ভিতরে ঢুকল।

দরজা পেরিয়ে কোন্ দিকে যাবে ভাববার মধ্যেই ভারী গলার স্বর শুনতে পেল। "এই যে, এদিকে আসুন।" দুই বন্ধু গলার আওয়াজ লক্ষ করে ছোট্ট বারান্দার মতো জায়গা পেরিয়ে বাঁদিকের একটা ঘরের কাছে এল। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল সুঠাম চেহারার বেশ বয়স্ক এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন ভিতরে টেবিলের উল্টোদিকে। ওরা যেতেই এবার প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার ভাই? বোসো।"

সোম আর বুড়ো চেয়ারে বসল। সোম দুবার কেসে নিয়ে বলল, "আমরা আজ সকালে কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপনটা পড়ে—"

সোম আর কথা বলতে পারল না। মাঝপথেই হঠাৎ ভদ্রলোক রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আরে এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম দেখছি!"

দুজনেই অবাক। ভদ্রলোক এক কথাতেই এত রেগে গেলেন কেন! কিন্তু এরপরে ওরা ভদ্রলোকের মুখ থেকেই যা শুনল, তাতে বুঝল এখানে এসে ওদের যথেষ্ট কাজ হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে ভদ্রলোকেরও রেগে ওঠার কারণ আছে।

ভদ্রলোক নিজে থেকেই বললেন, "ওরে বাপু, ওই বিজ্ঞাপন বেরুনোর পরে যা-যা করার আমরা করে ফেলেছি। পুলিশকে ইনফর্ম করে দিয়েছি। লেক টেরাসের ব্যারিস্টার প্রতাপ চাটুজ্যে ফোন করে বলে দিয়েছেন, ওই মেয়ের নাম মালতী পুরকাইত, ওঁদের বাড়িতে কাজ করত। দিন-পনেরো আগে ওঁদের বাড়ি থেকে একটা মোহর আর ওঁর গিন্নির গলার হার চুরি করে পালিয়ে গেছে। আজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বুঝেছেন—জিনিসপত্র যা চুরি গেছে তা তো গেলই, উপরন্তু এখন মরে গিয়ে ওঁদের ফাঁসিয়েও দিল। এখন ওঁদের আবার পুলিশে ইনফর্ম করতে হবে।"

বুড়ো সঙ্কোচের ভাব করে বলল, "ওহ্ আচ্ছা। আমরা শুধু শুধুই তাহলে খোঁজ করতে এসেছিলাম। আসলে আমার মাসির বাড়ির একজন···যাক্‌গে সে কথা। আপনাকে মিছিমিছি বিরক্ত করলাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ বাবা, গত দু-সপ্তা ধরেই আমি বিরক্ত হচ্ছি। শেষ বয়সে লোকের একটু উপকার করব বলে এই সৎকার সমিতি চালাচ্ছিলাম। এখন কবে পাট গোটাব তাই ভাবছি।"

সোমদেব বলল, "সত্যি আপনি খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন।"

"সে কি আজ থেকে!" ভদ্রলোক বললেন, "সেই অগাস্টের শেষদিকে ট্যাংরা তিলজলা থেকে ডেডবডি তুলে আনা তক্ আমার ঝঞ্ঝাট চলেছে। রাস্তায় মরে পড়ে থাকা একটা মেয়ে—তুলে এনে ক'দিন কোল্ড স্টোরেজে রাখলাম—যদি কেউ খোঁজখবর করে নিয়ে যায়। ও মা, কেউ তো এলই না, উপরন্তু আমার ভাল নেপালি দরোয়ানটাকে মেরে অজ্ঞান করে ডেডবডি পর্যন্ত চুরি হয়ে গেল!"

"অ্যাঁ সে কী!" বুড়ো বলে উঠল, "ডেডবডি আপনার এখান থেকে চুরি হয়ে গেল?"

"তা নয় তো আর বলছি কী!" ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "গাঁটের পয়সা খরচ করে এমনি কি আর কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে? তাও তো বেরুল আজ একসপ্তা

পরে।" একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন, "যাক, তবু শেষ পর্যন্ত একটা হদিস পাওয়া গেছে। এবার পুলিশ খুঁজুক সে মড়া এখন কোথায় পচছে, নাকি ভূত হয়ে কারুর ঘাড় মটকাচ্ছে! মরা মানুষ নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়ার কথা বাবা জন্মে শুনিনি। দিনকাল যে কী হল—!"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা আমরা উঠি। অহেতুক ডিস্টার্ব করলাম। চলি।"

ভদ্রলোক অন্যদিকে তাকিয়ে শুধু হাতটা একবার তুললেন।

গম্ভীর মুখে চুপচাপ হাঁটতে লাগল সোমদেব আর বুড়ো। ওদের লক্ষ্য লেক গার্ডেন্স বাস ডিপো। সেখানে যে-কোনো একটা বাস ধরে দেশপ্রিয় পার্ক। সারা রাস্তা কেউ একটাও কথা বলল না। সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তাঘাটের আলো জ্বলেছে। একটু আগেই একপশলা উড়ো বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট কাদা-মাখা।

একটা ফাঁকা বাসের দোতলায় বসে বুড়ো বলল, "বডি রেজিস্টারে যে এম পি অক্ষর দুটো দেখেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি ওটা মালতী পুরকাইত নামটার আদ্যক্ষর। কী বুঝলি সোম?"

সোমদের বলল, "মালতী ব্যারিস্টার প্রতাপ চাটুজ্যের বাড়ি থেকে মোহর আর হার চুরি করে পালিয়েছিল। তারপর মরে পড়ে ছিল তিলজলা ট্যাংরার কোনো রাস্তায়। সৎকার সমিতির গাড়ি সেখান থেকে ডেডবডি উদ্ধার করে। ক-দিন পরে আবার সেই বডি চুরি হয়ে যায়।"

"কেন?" মন দিয়ে সোমের কথা শুনতে-শুনতেই হঠাৎ প্রশ্ন করে বুড়ো।

"ভেরি ইজি।" সোম বলল, "মেয়েটা চুরি করা জিনিস বিক্রি করতে গিয়েছিল। সেখানে দরাদরি, কথা-কাটাকাটি। গোলমাল হওয়ায় সম্ভবত ওখানেই খুন হয়। যে বা যারা খুন করে তারা নিশ্চয়ই জানত মেয়েটা অর্নামেন্টস গিলে ফেলেছে। সুতরাং সেগুলো উদ্ধার করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা ডেডবডি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হবে। তাই না?"

"গুড। আই অ্যাপ্রিশিয়েট," বুড়ো বলল। "কিন্তু এবার আমি তোকে কয়েকটা পয়েন্টস্ দিচ্ছি। এক নম্বর, মালতী খুন হয়েছিল কি না আমরা শিওর নই। তবে, সম্ভাবনা বেশি। দু-নম্বর—মেয়েটা কিন্তু মারা যাওয়ার কিছু আগেই মোহর আর হার গিলেছিল। না হলে অন্তত হারটা স্টম্যাক থেকে পাশ করে যেত। আর তিন নম্বর হচ্ছে—মালতীর বডি কিভাবে ডিসেকশন হয়ে এল, সেটা এখনও আমরা জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এর পিছনে তাহলে একটা চক্র রয়েছে। আর সেই চক্র জানে—ওই বডি ডিসেকশন হচ্ছে। তারা লক্ষও রাখছে।"

সোমদেবের গা কেঁপে উঠল। বলল, "বুড়ো, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আমাদের ওপরেও লক্ষ রাখছে, তাই না?"

বুড়ো বলল, "খুব তাড়াতাড়ি এবার আমাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া কেস এখন পুলিশের হাতে।"

বাস চলতে শুরু করেছে। সামান্য কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। দুই বন্ধুই অনুভব করল ভয় আর আতঙ্কের একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন শিরদাঁড়া বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সোম বলল, "রিস্কটা

বেশি হয়ে যাচ্ছে না বুড়ো?"

"ঘাবড়াস না," বুড়ো বলল, "আমার বন্ধু সুদীপের বাবা খুব বড় পুলিশ অফিসার। আমি মেসোমশাইকে কায়দা করে একটা ফোন করব। আমরা কিন্তু রহস্যের অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়েছি। যদি সেরকম দরকার হয়—দেখি।" একটু চুপ করে থেকে বুড়ো আবার বলল, "শোন, কালকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে নিই।"

সোম বলল, "আমি ভেবে রেখেছি। সকাল সাড়ে-সাতটায় শিয়ালদা সাউথ স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে চলে আসবি। বাড়িতে বলব, এক বন্ধুর বাড়ির পুকুরে মাছ ধরা দেখতে যাব। ওখান থেকেই কলেজ চলে যাব। ঠিক আছে।"

"ভেরি গুড।" বুড়ো বলল।

দুজনে দেশপ্রিয় পার্কে নেমে পড়ল। বুড়ো সোমকে বলল, "চল, আগে তোকে বাসে তুলে দিই।"

পুজো এসে গেছে বলে জমজমাট দেশপ্রিয় পার্ক। হকার্স কর্নার আলোয় ঝলমল করছে। বেচাকেনা চলছে পুরোদমে।

॥ ৬ ॥

সুভাষগ্রাম রবিনবাবুর বাড়ি যাওয়ার জন্য শিয়ালদা সাউথ স্টেশনে পৌঁছে বুড়ো দেখল, টিকেট কাউন্টারের কাছে সোমদেব দাঁড়িয়ে আছে। ও কাছে আসতে সোম বলল, "চল। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখনই একটা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল আছে। ওটাই ধরব।"

ওরা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল। শিয়ালদা সাউথ স্টেশনটা এক ধরনের ভবঘুরে লোকজনের বস্তি আর বাজারের সংমিশ্রণ বলা যায়। তার ওপর একটু এগোতেই একটা আপ ডায়মণ্ডহারবার লোকাল এসে পৌঁছল। মুহূর্তে এক ভয়াবহ

পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। শম্বুক গতিতে এগোতে লাগল হাজার-হাজার মানুষের মাথা এবং তারপর মাথার ওপর বড়-বড় ঝুড়ি-হাঁড়ি-কলসি।

প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল ওদের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে। কিন্তু গাড়ি যেহেতু সময়মতো ছাড়ে না, সুতরাং ট্রেন ধরতে ওদের অসুবিধা হল না। একটা-একটা করে কামরা দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে গেল। দেখল পুরো গাড়িটাই আসলে বাজারের ব্যাপারি আর ফড়িয়াদের জন্য যেন নির্দিষ্ট। বড়-বড় ঝাঁকা বস্তা ঝুড়িতে ভর্তি। ভোররাতে জিনিসপত্র শাকসব্জি সব চালান দিয়ে দক্ষিণের লোকেরা ফিরছে। দিব্যি খোশমেজাজ। কেউ ঘুমুচ্ছে। কেউ তাস খেলছে কিংবা বিড়ি টানছে। ছোট-ছোট দলে অনেকে হিসেব-নিকেশ করছে কিংবা গল্পগুজব করছে। বুড়ো আর সোম একেবারে সামনের দিকে এসে একটা বসার জায়গা পেল জানলার ধারে। গাড়ি ছাড়ল দেরি করে। সোম জিজ্ঞেস করল, "বুড়ো, তোর বন্ধুর বাবা সেই মেসোমশাইকে ফোন করেছিলি ?"

"হ্যাঁ করেছিলাম। সুদীপ বাড়িতে ছিল না, মেসোমশাই ফোন ধরেছিলেন। দু-একটা কথাবার্তা হল। আমি তার মধ্যে জেনে রাখলাম, মেসোমশাই কলকাতাতেই আছেন। এখন অ্যাণ্ডারসন হাউসে বসছেন।" গাড়ি ছুটে চলেছে। যাদবপুরের পর যত দক্ষিণে যেতে লাগল, ওরা দেখল দু-পাশে প্রচুর গাছ-গাছালি, মাঠ, কোথাও ধানখেতের অফুরন্ত সবুজ। দূরে-দূরে হঠাৎ কোথাও গজিয়ে-ওঠা লম্বা সাদা কাশফুলের মাথা বাতাসে দুলছে। শালখুঁটির ওপর দিয়ে ইলেকট্রিক তার গেছে। ভিতরে ভিতরে বাড়ি উঠেছে। গড়িয়ার কাছে এসে সোম হাত দিয়ে একটা রাস্তা দেখাল বুড়োকে। "ওই দেখ বুড়ো, ওটা ইস্টার্ন বাইপাস। একেবারে এখান থেকে ভি আই পি রোডে পৌঁছেছে। আর এই কাছাকাছি জায়গাটা হচ্ছে পাটুলি।"

"অপূর্ব জায়গা রে!" বুড়ো বলল। "আচ্ছা এখানে জমির কাঠা কত করে বল তো ?"

"তা হবে কুড়ি-বাইশ হাজার। এখানে লটারি করে জমি বিক্রি করেছে।"

গল্প করতে করতে একসময় ওরা সুভাষগ্রাম পৌঁছে গেল। মোটামুটি শান্ত, নিরিবিলি জায়গা। স্টেশনের কাছেই ছোট বাজার বসেছে। কয়েকটা সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। সোমদেব একজন রিকশাওলাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই, মনসাতলা কোন্‌দিকে ?"

রিকশাওলা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। ওরা পুবদিকে হাঁটতে হাঁটতে চলল। মিনিট চোদ্দ-পনেরো প্রায় বেড়ানোর মতো হাঁটতে-হাঁটতে ওরা একটা ছোট্ট বাগান-ঘেরা মন্দিরের কাছে পৌঁছল। সোম বলল, "দাঁড়া, মনে হচ্ছে এটাই মনসাতলা।"

এক ভদ্রলোক অফিস যাচ্ছিলেন। সোম তাঁকেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, এটা কি মনসাতলা ?"

"হ্যাঁ। কার বাড়ি খুঁজছেন ? ভদ্রলোক ব্যস্ততার মধ্যে নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন।

সোম বলল, "রবিন আচার্য। ওই কলকাতা—"

"মড়া কাটার ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে তো ?" নাম শুনেই ভদ্রলোক চিনে ফেললেন। তারপর ওরা আর কিছু বলার আগেই বললেন, "সোজা গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা। টিউবওয়েলের উল্টো দিকের বাড়িটাই রবিন আচার্যের।" ভদ্রলোক সোজা হাঁটতে শুরু করলেন সামনে। একটু এগিয়ে দূর থেকেই বললেন, "সামনে নেমপ্লেট আর লেটার-বক্স আছে, দেখবেন।"

বুড়ো চেঁচিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক য়্যু দাদা।"

ভদ্রলোক ততক্ষণে হনহন করে এগিয়ে গেছেন অনেকটা।

ছিমছাম ছোট সুন্দর বাড়ি রবিনবাবুর। বাইরে লেটার বক্সের পাশে কলিং বেল রয়েছে। সোমদেব সুইচ টিপল। জানালার গ্রিল থেকে মুখ বাড়ালেন এক বৃদ্ধ। "কে ? কাকে চাই ?"

"রবিনবাবু আছেন ?"

"দেখছি।" ভদ্রলোক সরে গেলেন। ওরা বাইরে থেকে শুনতে পেল বৃদ্ধের গলা, "ভজা, গিয়ে বল রবিনকে কারা ডাকছে।"

মিনিট-খানেকের মধ্যে এক মহিলা এলেন। "কাকে চাইছ ভাই ?"

"আমরা একটু রবিনবাবুর সঙ্গে দেখা করব। বলুন আমরা কলেজ থেকে এসেছি।"

"কিন্তু উনি তো বেরিয়ে গেছেন খানিকক্ষণ আগেই। কলকাতাতেই গেছেন। কিছু বলতে হবে ?"

বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল দুই বন্ধুই। এটুকুর জন্য ওদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। সোম বলল বুড়োকে, "কী রে, কী করবি ?"

বুড়ো একটু ভেবে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরবেন ?"

"তা প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় ওঁর ফিরতে। তোমরা ভেতরে এসো না।"

"না, ঠিক আছে। আমরা ওঁর সঙ্গে কলেজে দেখা করে নেব। চলি।"

সোম হঠাৎ বলল, "আমি এক গ্লাস জল খাব।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এসো, ভেতরে এসো।" ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। "তোমরা বোসো।"

মাঝারি সাইজের গোছানো ঘর। মাঝখানে নিচু টেবিল। বই, পত্র-পত্রিকা, প্যাড রয়েছে ওপরে। দুটো সোফা, কয়েকটা চেয়ার বসার জন্য। ভদ্রমহিলা ভিতর-বাড়ি থেকে প্লেটে সন্দেশ আর জলের গ্লাস নিয়ে এলেন। বুড়ো টেবিলের ওপর খোলা পড়ে থাকা একটা প্যাডের ওপরের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বলল, "আপনাদের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে যাই।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" ভদ্রমহিলা বললেন। "কত দূর থেকে এলে তোমরা, কিন্তু দেখা হল না।"

বুড়ো কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। বলল, "না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা চলি।"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সোম বলল, "ধুত্, সকালটাই মাটি।"

বুড়ো বলল, "কাল কলেজে যাননি রবিনবাবু। ন্যাচারালি আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছেন। যাই হোক, একটা ছোট্ট আউটিং হয়ে গেল ফ্রেশ এয়ারে।"

কথা বলতে বলতে ওরা আবার স্টেশনের রাস্তা ধরল। সোম কী একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চাপা গলায় বলল, "বুড়ো, সামনে দ্যাখ কে আসছে!"

দুজনেই বিস্মিত। ওদের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকেই হেঁটে সামনে আসছেন কলেজের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের আর্টিস্ট বি[redacted] কয়েকটা মুহূর্ত নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। তার মধ্যেই এগিয়ে এলেন বিশ্বনাথবাবু। বললেন, "তাহলে আপনারাও চলে এসেছেন রবিনবাবুর খোঁজে। দরকারটা খুব জরুরি নিশ্চয়ই ?"

বুড়ো মুখটা পাথরের মতো শক্ত আর গম্ভীর করে বলল, "কিন্তু আপনারও গিয়ে লাভ নেই। রবিনবাবু বাড়ি নেই।"

"তাই নাকি ! এর মধ্যে বেরিয়ে গেছেন ?" মুহূর্তের জন্য অবাক হয়েই বিশ্বনাথ বললেন, "ঠিক আছে। কলেজেই দেখা হবে তাহলে। কিন্তু আপনাদের আসাটা একেবারে মাঠে মারা গেল।...আচ্ছা..."

সোম জিজ্ঞেস করল, "আপনি ফিরবেন না ?"

বিশ্বনাথবাবু কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যাই একটু ঘুরে-ফিরে...আপনারা ...আপনারা এগোন।" ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু পিছন ফিরে তাকালেন আবার।

বুড়ো আর সোমদেব এগিয়ে গেল নিজেদের রাস্তায়। বুড়ো খুব গম্ভীরভাবে বলল, "এড়িয়ে গেল।"

সোমদেব বলল, "বুড়ো, হুট করে শুধু আমাদের দুজনের এতদূর আসাটা বোধহয় ঠিক হয়নি।"

বুড়ো বলল, "এ-কথাটা আগে মনে হওয়া উচিত ছিল আমাদের। যাই হোক তাড়াতাড়ি চল। আর আজকে কলেজে রবিনবাবুর কাছ থেকে নিশ্চয়ই আইডিয়া নিতে হবে বডি আসার হিসেব কে রাখে। কেননা, আমার মনে হচ্ছে যতজনের অ্যানাটমিতে ফ্রি যাতায়াতের সুযোগ আছে, তাদের মধ্যে যে-কোনো কারুর একা অথবা কয়েকজনের একসঙ্গে এ-ব্যাপারে কিছু হাত থাকতে পারে। মথুরাবাবুর কথাটা ভুলিস না।"

স্টেশনে এসে ওরা শুনল গাড়ির খুব গোলমাল। কোনো খবর নেই, পরের গাড়ি কখন আসবে। বুড়ো ঘড়ি দেখল। পৌনে দশটা। কিছু করার নেই। বাজারের সামনে থেকে বাস আছে গড়িয়া পর্যন্ত। কিন্তু তাতে অসম্ভব ভিড় এবং কখন ছাড়ে না ছাড়ে কিছু ঠিক নেই। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই।

দুই বন্ধুর কারুর মুখে কথা নেই। বসে, দাঁড়িয়ে, পায়চারি করে সময় কাটাতে লাগল।

॥ ৭ ॥

প্রায় সাড়ে-বারোটা নাগাদ সোমদেব আর বুড়ো বালিগঞ্জ স্টেশন হয়ে কলেজের বাস-স্টপে নামল। সুভাষগ্রাম স্টেশনে বিরক্তিকর সওয়া এক ঘণ্টা সময় অপচয় করার পর, অসম্ভব ভিড় একটা ট্রেনে শেষপর্যন্ত কোনোমতে উঠতে পেরেছিল। প্রায় গুড়ের নাগরির মতন অবস্থায় বালিগঞ্জেই নেমে পড়েছিল। সেখান থেকে বাস ধরে কলেজ। কিন্তু তখনও ওরা জানত না কী বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে।

কলেজের গেট দিয়ে ঢোকার আগেই দেখল একটা ছোট্ট দল অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের হেড-ডোম ঝগড়ুকে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে। আরও আশ্চর্যের কথা সেই দলটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন আর্টিস্ট বিশ্বনাথ এবং মথুরাবাবুও।

সোমদেব আকাশ থেকে পড়ার মতন বলল, "বুড়ো, এসব কী হচ্ছে রে ! বিশ্ব[redacted]ন কী করে আমাদের আগে ?"

আর কোনো কথা না বলে সোমদেব দৌড়ে যাচ্ছিল দলটার কাছে। খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরলো বুড়ো। "কী করছিস সোম! তোর মাথা খারাপ হল নাকি?"

"কেন? দেখে আসি ব্যাপারটা কী! তাছাড়া বিশ্বনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করব না, উনি গাড়ি না থাকা সত্ত্বেও সুভাষগ্রাম থেকে পৌঁছলেন কী করে!"

বুড়ো তা সত্ত্বেও টেনে নিয়ে এল সোমদেবকে। "এদিকে আয়। খবর্দার যাস না আমি বলছি। তাছাড়া কী লাভ বিশ্বনাথবাবু যা হোক কিছু একটা বলে দেবে। বাসে করে এসেছে বলে দিতে পারে। তারপর তুই কী বলবি? আর মথুরাবাবুকেই বা কী জিজ্ঞেস করবি, ওঁর সঙ্গে তো আর আমাদের দেখা হয়নি।"

"ঝগড়ুকে কে বা কারা মারল সেটাও জানার দরকার নেই?" সোমদেবের কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল ও বুড়োর বাধা দেওয়ায় রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বুড়ো বলল, "সবটাই জানার দরকার আছে। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর মধ্যে নয়। ঘটনা কী ঘটেছে আমরা দেখেছি। কেন ঘটল এবং কারা ঘটাল সেটা অন্যভাবে আমাদের জানতে হবে। নয়তো শুধু শুধু নিজেরা বেশি এক্সপোজড হয়ে যাব, এটা তুই কেন বুঝতে পারছিস না সোম?"

"ঠিক আছে, তুই যা ভাল বুঝিস।" সোমদেবের গলায় সামান্য অভিমানের ছোঁয়া।

"রাগ করিস না সোম।" বুড়ো বলল, "আমি তোকে কথাগুলো ভেবেই বলছি। টেনশনের সময় মাথাটা বেশি ঠাণ্ডা রাখা দরকার। চল—আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।"

চুপচাপ ক্যান্টিনে বসে খাওয়া-দাওয়া করল দুজন। বুড়ো বলল, "সোম, ঠিক পৌনে দুটোর সময় আমরা দোতলায় রবিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

"আচ্ছা," সোমদেব বলল। "আমি তাহলে কমনরুমে যাচ্ছি। টেবল টেনিস খেলতে।"

"ঠিক আছে যা। আমি হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে একটু খবর নিয়ে আসি।"

দুজনেই ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পৌনে দুটোর সময় এদিক-ওদিক ঘুরে দুজনে রবিনবাবুর ঘরে গেল। কীভাবে কথা বলবে সব ঠিক করাই ছিল। সোমদেবের দু-একটা কথা শুনে বুড়ো বুঝল কিছুক্ষণ আগেকার সেই ক্ষোভটা সোমের আর নেই।

রবিনবাবুর ঘর খোলা ছিল। ওরা বাইরে থেকেই দেখতে পেল ভদ্রলোক জামা খুলে গেঞ্জি গায়ে কাজকর্ম করছেন খাতাপত্র ফাইল ইত্যাদি নিয়ে। পাখা চলছে ঘরে।

বুড়ো ঢুকে প্রথমে কথা বলল। "স্যার, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। আমরা দুজনেই ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। আপনার কাছ থেকে কয়েকটা জিনিস···এই জাস্ট্ কিউরিওসিটির জন্য···"

রবিনবাবু স্যার বলাতে সম্ভবত খুশিই হলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "বোসো। কী ব্যাপার বলো শুনি।"

সোম বলল, "আমরা স্যার ঘুরতে ঘুরতে আজ আপনার বাড়িতেই চলে গিয়েছিলাম সকালে। আপনি অবশ্য তখন—"

"আমার বাড়িতে? আজ সকালে!" প্রথমে অবাক হয়ে

তারপর একটু দুঃখিত গলায় বললেন, "ভেরি সরি। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তা বলো, তোমাদের কী কিউরিওসিটি।"

কথা বলতে বলতে লেখা থামালেন রবিনবাবু। খাতা বন্ধ করে রাখলেন। পেনের ঢাকনাটা খুঁজে না পেয়ে এমনিই রেখে দিলেন টেবিলে। তারপর চেয়ারের পিছন থেকে জামাটা গায়ে দিয়ে ফিটফাট হয়ে বসলেন। বুড়ো বলল, "আচ্ছা স্যার, আমাদের ছুটির পর আবার কবে ডিসেকশন হবে?"

"মনে হয় নভেম্বরের শেষ দিক থেকে। অবশ্য সবই ডিপেণ্ড করে বডি আসার ওপর। তোমরা এখন কোন্ পার্ট ডিসেকশন করছ?"

"অ্যাবডোমেন, স্যার।" বুড়ো বলল।

"আপনি স্যার অনেক দিন আছেন কলেজে, তাই না?" সোম জিজ্ঞেস করল।

"তা ধরো তোমাদের এখানকার কয়েকজন মাস্টারমশায়ের থেকেও আমি পুরনো লোক। রবিনবাবু বললেন। "তোমাদের বয়স কত?"

"সতেরো বছর কয়েক মাস, স্যার।" সোমদেব বলল।

"তাহলে তোমাদের জন্মের সময় থেকেই আমি এখানে আছি।"

"উরিব্বাস, এতদিন!" বুড়ো বলে উঠল। তারপরেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, ডিসেকশনের বডি আসে কীভাবে, কারা দেয়?"

"সে অনেকরকম সিস্টেম আছে," রবিনবাবু ঢাকনা খোলা পেনটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "কর্পোরেশন দেয়, হাসপাতালের আনক্লেইমড্ ডেডবডি আসে। কখনো-সখনো পুলিশও দেয়।"

"এসব বডি কেউ চিনতে পারে না, স্যার?"

সুস্বাস্থ্যের জন্য আসল আয়ুর্বেদিক টনিক এখন নতুন সাজে

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ

শক্তি আর পুষ্টি দিতে ৪ ভাবে সমৃদ্ধ

১ ৪৮টি প্রয়োজনীয় এবং অবিষাক্ত গাছ-গাছড়া ও উপাদান দিয়ে তৈরি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে বছরভোর আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।

২ সর্দি-কাশি এবং শারীরিক দুর্বলতার মহৌষধ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। কারণ, একমাত্র এই চ্যবনপ্রাশেই আছে ৪টি বিশেষ উপাদান– মকরধ্বজ, অবর্কভস্ম, শৃংভস্ম এবং কেসর।

৩ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ যোগায়। অন্যান্য টনিকের মতো রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নয় বলে এই ভিটামিন ও খনিজ সহজেই শরীরে মিশে যায়।

৪ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষেই উপকারী। বড়দের জন্য প্রতিদিন দু'বার এক চামচ করে চ্যবনপ্রাশ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, পুষ্টি যোগায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দু'বার এক চামচ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ শীতের নানান রোগ বালাই ঠেকিয়ে রাখে।

এখন আধুনিক আকর্ষণীয় পলিপ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে

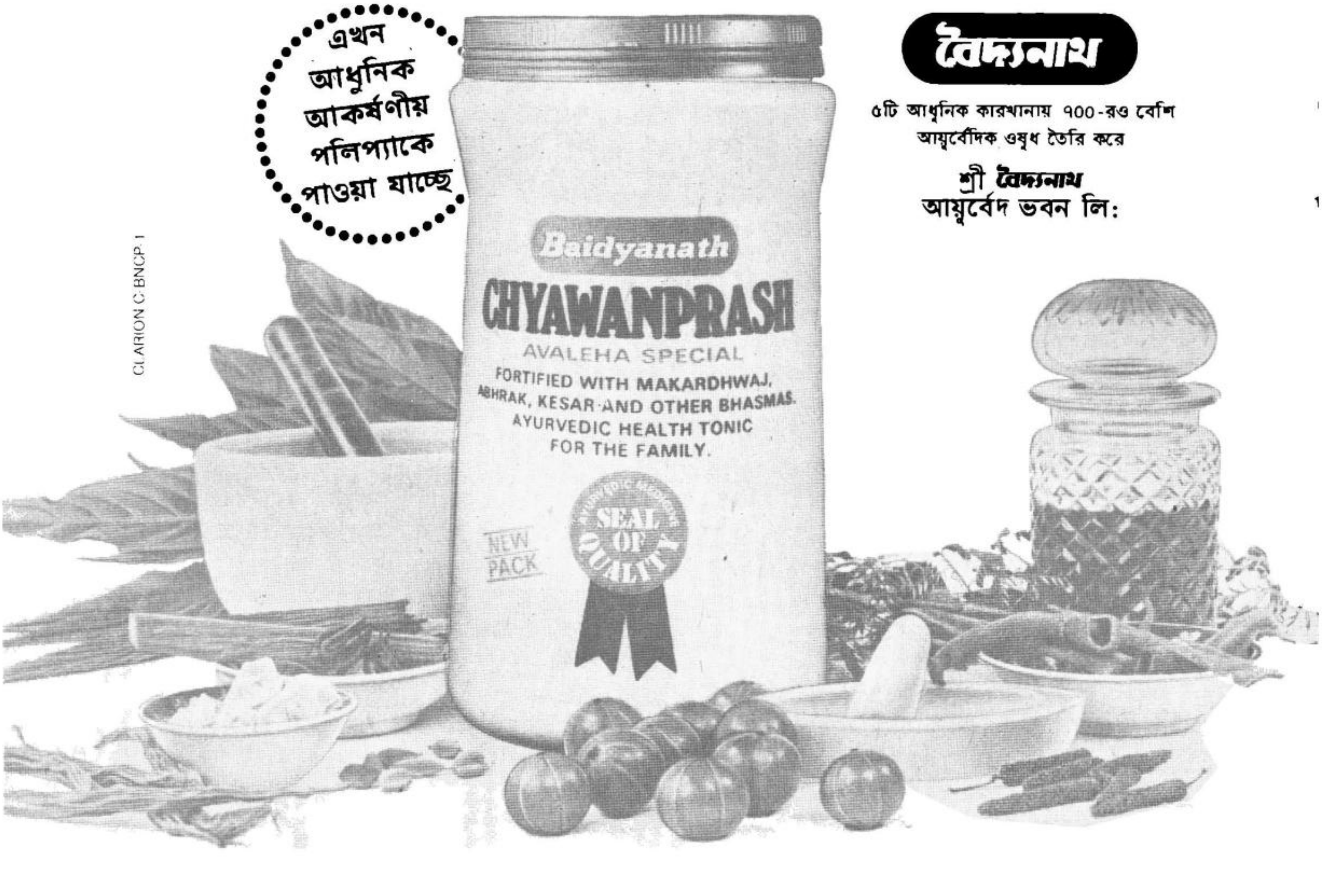

বৈদ্যনাথ

৫টি আধুনিক কারখানায় ৭০০-রও বেশি আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে

শ্রী বৈদ্যনাথ
আয়ুর্বেদ ভবন লি:

CLARION C BNCP 1

"চিনলে কি আর তোমাদের কাটাছেঁড়া করার জন্য দিত ?"

"আপনারা লিখে রাখেন না স্যার ?"

"এতসব তোমাদের না জানাই ভাল, ডিসেকশন করতে অস্বস্তি বোধ করবে। তবে, যে বডি সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় সেইগুলো মোটামুটি লিখে তো রাখতেই হয়। এ কাজগুলো অবশ্য মথুরাবাবু, কিউরেটর অধীরবাবু দেখাশোনা করেন। তবে আসল ইনচার্জ তো আমাদের ঝগড়ুসাহেব।"

বুড়ো হঠাৎ বলল, "ঝগড়ু স্যার আজকে মার খেয়ে ইনজিওর্ড হয়েছে, জানেন তো ?"

"তোমরা কোথায় দেখলে ?"

"ওই তো স্যার অনেকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল।"

"ইশ্-শ্। কোথায় যে কী করে লোকটা ! চব্বিশঘণ্টা নেশাভাঙ করে থাকে। রোজ ঝামেলা। দেখি, একবার আবার যেতে হবে।" একটু থেমে রবিনবাবু আবার বললেন, "আচ্ছা, তোমরা হলে যাও। আমি ঝগড়ুকে একটু দেখে আসি। এসো মাঝে-মাঝে কিছু জানতে-টানতে ইচ্ছে করলে।"

"আচ্ছা স্যার। পরে আর একদিন আসব।"

"এসো। এসো।"

বেরিয়ে এল দুই বন্ধু। তিনতলায় যেতে যেতে সোম বলল, "স্যার বলায় হেভি খুশি হয়েছেন মনে হল।"

বুড়ো বলল, "রবিনবাবুই হচ্ছেন কাজের লোক। কিন্তু সোম, মথুরাবাবু সম্বন্ধে আমরা কোনো খবর জানি না এখনও। এদের সকলের কাছেই ডিপার্টমেন্টের খোঁজ-খবর আছে।"

"আমরা প্রত্যেকের এক-একটা ইন্টারভ্যু নিতে পারলে ভাল হত।" সোম বলল।

বুড়ো সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, "আমরা বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়ছি সোম।"

॥ ৮ ॥

তিনতলা হলের মুখে এসেই সোমদেব আর বুড়ো দেখল বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ওদের সাত নম্বর বডির সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছে এবং কথাবার্তা বলছে। বুড়ো বলল, "কী ব্যাপার বল তো, সবাই আমাদের বডিতে কী দেখছে !" বলতে বলতেই ওরা নিজেদের ডিসেকশনের বডির কাছে এসে পৌঁছল। পর মুহূর্তেই চক্ষুস্থির ! কে বা কারা ওদের বডিটার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব টানাটানি কাটাছেঁড়া করেছে। যেন কিছু খোঁজার চেষ্টা করেছে।

সোম বুড়োর দিকে তাকাল। দেখল বুড়োর চোখদুটো আতঙ্কে রাগে ক্ষোভে যেন জ্বলছে, আর এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছে। হঠাৎ বুড়ো নিচু হয়ে মাটি থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিল সকলের অলক্ষ্যে। তারপর কারুর সঙ্গে কথা না বলে আস্তে আস্তে সরে গেল ওখান থেকে। সোম বুঝল, বুড়ো ইচ্ছে করে সরে গেল। এখনই ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

ডিসেকশন হলে ছেলেমেয়েদের ভিড় বাড়ছে। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে যথারীতি। সকলের মুখে-মুখে সাত নম্বর বডিটার কথা ছড়িয়ে পড়ছে। স্যারেরা এসে পড়লেই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।

সোম আস্তে আস্তে পুবদিকের জানলার কাছে গেল বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে। বুড়োর মুখ ভয়ংকর গম্ভীর। কান দুটো লাল হয়ে রয়েছে। সোম আস্তে বলল, "বুড়ো, কেস খুব সিরিয়াস।"

বুড়ো চাপা গলায় বলল, "সোম, বডি যখন তছনছ হয়েছে, আমি শিওর যে বা যারা এটা করেছে তারা আজকেই স্টম্যাকটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। আর চান্স নেবে না। আমার মনে হয়—"

হঠাৎ চুপ করে গেল বুড়ো। পরমুহূর্তেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "সোম, এক্ষুনি চলে আয়। আমরা খুব বিপদের মধ্যে রয়েছি। তাড়াতাড়ি, দেরি করিস না।" বুড়োর গলার সুরে ত্রাস, ব্যস্ততা।

ওরা কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত হলের বাইরে চলে এল। দলে দলে ছেলেরা হলে ঢুকছে। ওরা তাদের পাশ কাটিয়ে টপাটপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দোতলা দিয়ে যাওয়ার সময় পলকে চোখে পড়ল বিশ্বনাথবাবু, মথুরাবাবু, রবিনবাবু, অধীরবাবু, টাইপিস্ট সকলে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে খুব সিরিয়াসভাবে কী আলোচনা করছে। ওরা ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। নীচে নেমে ছুটতে ছুটতে একেবারে রাস্তায়। গেটের বাইরে এসেই বুড়ো একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামাল। উঠে পড়েই পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে বুড়ো বলল, "সর্দারজি, থোড়া জলদি চলিয়ে। অ্যাণ্ডারসন হাউস।"

তারপর সোমদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর কাছে ক' টাকা আছে ?"

"এগারো-বারো টাকা হবে।"

"ঠিক আছে।"

আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল। ট্যাক্সি ছুটে চলল। সোমদেব বুঝল ওরা বুড়োর বন্ধু সুদীপের বাবা ডি আই জি-র অফিসে যাচ্ছে। কিন্তু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না বুড়োকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটার দেখে বুড়ো বলল, "সোম পাঁচ টাকা দে।"

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দুজনে লিফ্টের কাছে এল। তিনতলায় উঠে এল। বুড়ো একটা স্লিপে ওদের দুজনের নাম আর ভেরি আর্জেন্ট লিখে, ইউনিফর্ম পরা এক সার্জেন্টের হাতে দিল। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই সেই ভদ্রলোক ওদের ডেকে নিয়ে গেলেন ডি আই জি মিস্টার রামগতি ব্যানার্জির ঘরে।

বিশাল সাজানো ঘর। খুব বড় একটা টেবিলের উলটো দিকে সুদীপের বাবা গম্ভীরভাবে বসে টেলিফোনে কথা বলছেন। প্রচুর মোনোগ্রাম লাগানো রয়েছে ওঁর বুকের ইউনিফর্মের ওপর। হাত দেখিয়ে দুজনকে বসতে বললেন সামনের গদি-আঁটা চেয়ারে। টেবিলের ওপর গোটা পাঁচ-ছয় বিভিন্ন রঙের টেলিফোন, বড় বড় অ্যাশট্রে, টেবিল ল্যাম্প, কাগজ খাতা ফাইল, চকচকে পেপারওয়েট। পেইন্ট-করা দেয়াল থেকে পর্দা ঝুলছে পেলমেটের ভিতর থেকে। উঁচু ছাদ, দু-ব্লেড লাগানো ব্রিটিশ আমলের পাখা। একদিকে ইজিচেয়ার, অ্যাটাচড টয়লেট। সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে ঘর থেকে। ডি আই জি-র চেয়ারের উলটো দিকে মহাত্মা গান্ধির বড় অয়েল-পেইন্টিং।

টেলিফোন ছেড়ে মিস্টার ব্যানার্জি ঘুরে তাকালেন ওদের

দিকে। ভীষণ স্মার্ট আর ভারী গলায় বললেন, "কী রে বুড়ো, কী ব্যাপার ! সকালে ফোন করলি আবার এখন ভেরি আর্জেন্ট লিখে ছুটে এলি !" এটুকু বলেই পাশে সোমদেবের দিকে তাকালেন। "এ কে, তোর বন্ধু ?"

"হ্যাঁ মেসোমশাই, আমার বন্ধু সোমদেব মুখার্জি।"

সোম তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। মিস্টার ব্যানার্জি হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিলেন। "ঠিক আছে থাক্। পরে হবে। বোসো।"

তারপর আবার বললেন, "বল কী ব্যাপার ! তোদের চোখমুখ দেখে তো মনে হচ্ছে একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিয়ে এসেছিস !"

বুড়ো খুব সোজাসুজি বলে ফেলল, "আমরা খুব বিপদে পড়েছি মেসোমশাই। আপনাকে আমাদের বাঁচাতে হবে।"

মিস্টার ব্যানার্জি খুব গম্ভীর হয়ে বুড়োর মুখটা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর হাত দেখিয়ে ইশারায় সেই সার্জেন্ট ভদ্রলোককে চলে যেতে বললেন। বুড়ো আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। হুড়মুড় করে সেই ডিসেকশন করতে গিয়ে কাটা স্টম্যাকের মধ্যে থেকে হার আর মোহর পাওয়া থেকে শুরু করে একটু আগের ঘটনা পর্যন্ত সব বলে গেল। কিচ্ছু বাদ দিল না। সোমদেব মাঝে-মাঝে ওকে শুধু সাহায্য করল কিছু বাদ দিলে। মিস্টার ব্যানার্জির চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটু একটু করে উনি সিরিয়াস হয়ে উঠছেন। মাঝখানে একবার টেলিফোন তুলে বলে দিয়েছিলেন যেন আপাতত ওঁর ঘরে কোনো কানেকশন না দেন। হি ইজ বিজি।"

বুড়ো শেষ করার পর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন মিস্টার ব্যানার্জি। তারপর মুখে পাইপ দিয়ে বললেন, "তোদের বাড়িতে জানে এসব ঘটনা ?"

বুড়ো কোল্ড ড্রিংকস খেতে খেতে মাথা নিচু করল। "না, মেসোমশাই। আসলে—"

"খুব অন্যায় করেছিস।" বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে নিজেদের কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ফেলতে পারো—এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো ধারণা নেই।"

বুড়ো আর সোম দুজনেই মাথা নিচু করে বকুনি খেল। মিস্টার ব্যানার্জি আবার বললেন, "যাক। বুদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত যে এখানে এসেছিস, সেটাই রক্ষে। বোস তোরা এখানে, আমি আসছি। কিছু খাওয়া হয়েছে সকাল থেকে ?" নীরবে বসে থাকতে থাকতেই এবার মনে হল ধড়ে প্রাণ এসেছে। বুড়ো আস্তে বলল, "হ্যাঁ মেসোমশাই, খেয়েছি।"

জুতোর শব্দ তুলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোলেন মিস্টার ব্যানার্জি। লম্বা সুন্দর স্বাস্থ্য আর অসম্ভব ব্যক্তিত্ব। দরজার কাছ থেকে ঘুরে বললেন, "সতীশ পাল স্ট্রিটটা লেক গার্ডেন্সের কাছে বললি না ? তার মানে ওটা লেক গার্ডেন্স থানাই হবে।" বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

সোম ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বুড়ো, কী হবে মনে হচ্ছে ?"

"চুপচাপ থাক।" বুড়ো বলল, "মেসোমশায়ের কাছে যখন সারেণ্ডার করেছি, আর ভয় কী ! তাছাড়া অন্যায় তো কিছু করিনি। কালপ্রিটকে আমরা ধরব, দেখ না।"

মিনিট-দশ পরে মিস্টার ব্যানার্জি ঘরে ঢুকলেন। গম্ভীরভাবে হাতে পাইপ নিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, "শোন বুড়ো, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। আমি এইমাত্র লেক গার্ডেন্স থানার ওসি-র সঙ্গে নিজেই কথা বললাম।" পাইপ ধরালেন মিস্টার ব্যানার্জি। ওরা দুজন উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল। আবার বললেন, "ব্যারিস্টার প্রতাপ চাটুজ্যে আর বঙ্গীয় সৎকার সমিতির ফোন পেয়ে গতকালই লেক গার্ডেন্স থানা তিলজলা এরিয়ার গোটা-পাঁচেক নোটোরিয়াস লোককে ধরেছে। মারধোর দেওয়ার পরে, ওদের মধ্যে একজন লোক স্বীকার করেছে—ওই মালতী পুরকাইত মেয়েটা ওর কাছে চোরাই জিনিস বিক্রি করতে গিয়েছিল এবং সেখানে কথা-কাটাকাটি হয়। মেয়েটা তখন সোনার জিনিসগুলো গিলে ফেলে ! তারপর মারামারি হয়। কিন্তু মেয়েটার ফিট হওয়ার রোগ ছিল বলে দুম করে মরে যাবে সেটা ওরা বোঝেনি। ফেলে পালায়। কিন্তু গয়নাগাটি ওর কাছে রয়েছে জানত বলে আবার বডি চুরি করে আনে সৎকার সমিতি থেকে। সবই স্বীকার করেছে। কিন্তু সেই বডি তোদের কলেজে অ্যানটমি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির পিছনে আর একটা বড় চক্র রয়েছে। সে সম্বন্ধে লোকটা বিশেষ মুখ খোলেনি। জটিলতা সেই জায়গাটাতেই খুব বেশি এখনও।"

বুড়ো ফট করে বলে ফেলল, "মেসোমশাই, আমি সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারব ?"

"তাতে কী লাভ হবে ?"

"আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, আমরা তাহলে কালপ্রিটকে ধরতে পারব।" বুড়ো উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "মেসোমশাই, চুরি করা বডি যখন কলেজে ডিসেকশনের জন্য গেছে, তখন নিশ্চয়ই সেই চক্রের লোকজন ওখানে আছে এবং তারা ওই গলার হার এবং মোহর উদ্ধারের চেষ্টায় রয়েছে।"

"বুঝলাম। কিন্তু তাদের ধরবি কী করে ? হাতেনাতে প্রমাণ চাই তো।" মিস্টার ব্যানার্জি বুড়োর কথা খুব মন দিয়ে শোনার পর বললেন।

বুড়ো বলল, "মেসোমশাই, আমাদের যা ধারণা আর হিসেব, তাতে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের কালপ্রিটরা আজকেই আমাদের লকার থেকে স্টম্যাক চুরি করবে। আমরা যদি সেই সময় ওদের ধরি ? আমরা আগে থাকতে ডিসেকশন হলে লুকিয়ে বসে থাকব।"

বুড়োর প্রস্তাব শুনে মিস্টার ব্যানার্জি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে পাইপ টানলেন। তারপর বললেন, "খুব ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস পড়িস, তাই না ?" একটু থেমে আবার বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। তোদের প্ল্যান অনুযায়ী দেখা যাক কী ব্যবস্থা করা যায়। বিপদ তো তোমাদের নয়, এ হচ্ছে বাবা-জ্যাঠা-মেসো-পিসে হওয়ার বিপদ। বড় হলে বুঝবি।"

মেসোমশায়ের কথা শেষ হতেই অর্ডালি গোছের একজন লোক ঘরে ঢুকল, হাতে ট্রে নিয়ে। ওদের সামনে নামাল। প্লেটের মধ্যে প্যাটিস, সন্দেশ আর কফি রয়েছে। মিস্টার ব্যানার্জি বললেন, "খেয়ে নে। তোদের ডিসেকশন হল তো পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে, তাই না ?"

বুড়ো বলল, "হ্যাঁ মেসোমশাই।"

মিস্টার ব্যানার্জি ঘড়ি দেখলেন। সওয়া তিনটে। বললেন,

"ঠিক আছে। তোদের নিয়ে লেক গার্ডেন্স থানায় একবার যাব। হাতে সময় আছে।"

॥ ৯ ॥

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। অ্যানাটমি ডিসেকশন হলের তিনতলায় একটা সাইড-রুমে বুড়ো আর সোমদেব বসে আছে। থমথমে, চুপচাপ ফাঁকা হল। হাতঘড়ির রেডিয়ামে বুড়ো সময় দেখল পাঁচটা পঁচিশ। জানলার ফাঁকফোকর থেকে বাইরের আলো আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের দুজনের হাতেই আট ব্যাটারির বড় টর্চ। তাছাড়াও বুড়োর কাছে আর-একটা লুকনো অস্ত্র আছে।

প্রায় আধঘণ্টা আগে হল একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। ডি আই জি মিস্টার ব্যানার্জি আগেই টেলিফোনে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ডিটেল কথা বলে রেখেছিলেন। তারপর সাদা পোশাকে বুড়ো আর সোমকে নিয়ে সঙ্গে লেক গার্ডেন্স থানার ও· সি· কিঙ্কর দাশগুপ্ত সহ নিজেই এসেছিলেন কলেজে। পাকেচক্রে পরিচয় বেরিয়ে পড়েছিল। মেসোমশাই মিস্টার ব্যানার্জি আর অ্যানাটমির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ডক্টর ব্রজেন লাহিড়ি এক সময় ক্লাসমেট ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। আলাদা ঘরে বসে বসে সব কথাবার্তা বলেছিলেন। তারপর বুড়োর প্ল্যান অনুযায়ী ওদের দুই বন্ধুকে ফাঁকা হল-ঘরে লুকিয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ফাঁকা ডিসেকশন হলে নিঃসাড়ে দুজনের ঢুকে যেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বেয়ারাও কিছু না জেনে বাইরে থেকে তালা আটকে চলে গেছে। চলে গিয়েছেন মিস্টার ব্যানার্জি, কিঙ্কর দাশগুপ্ত এবং ডক্টর লাহিড়িও। এখন শুধু প্রতীক্ষায় বসে থাকা কখন দুর্বৃত্ত আসবে কাটা স্টম্যাকের মোহর আর হার উদ্ধার করতে।

স্তব্ধ ডিসেকশন হলে ভৌতিক পরিবেশ। দুর্গন্ধ থমকে রয়েছে দরজা-জানলা বন্ধ করা বদ্ধ বাতাসে। ঘড়ির টিকটিক শব্দও কানে আসে। কোনো কল থেকে জল পড়ছে ক্লপ ক্লপ করে। মাঝে-মাঝে খুরখুর করে কিছু পালানোর শব্দের সঙ্গে ওদের চোখে পড়ছিল জোড়া জোড়া ছোট্ট লাল চুনির মতন ছুঁচো ইঁদুরের চোখ। ওদের দুজনকে হলে পৌঁছে দেওয়ার সময় মিস্টার ব্যানার্জি বলেছিলেন, "তোদের পাল্লায় পড়ে এই বয়সে নরকদর্শনটা হয়ে গেল।"

অ্যাণ্ডারসন হাউস থেকে বেরিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি বুড়ো আর সোমদেবকে নিয়ে লেক গার্ডেন্স থানায় গিয়েছিলেন। ডি আই জি আসায় ওখানে সবাই খুব তটস্থ ছিলেন। বুড়োর ইচ্ছে অনুযায়ী মিস্টার ব্যানার্জি লক-আপের মধ্যে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ও আলাদাভাবে লোকটির সঙ্গে কথা বলেছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট সেই লোকটার সঙ্গে, যে সব কিছু স্বীকার করেছিল, কথা বলে বুড়ো বেরিয়ে এসেছিল। তখন ওর চোখে-মুখে উত্তেজনা, বিস্ময়, আত্মবিশ্বাস সব মেশামিশি ছিল। শুধু সোমদেবকে বলেছিল, "সোম, সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপার। অ্যানাটমি হলে ডেডবডি যাওয়া-আসা নিয়ে অনেক দিন থেকেই এক দুর্নীতির চক্র কাজ করে চলেছে। কিন্তু পালের গোদা আজ ধরা পড়বেই সে আর

রিস্ক নিতে পারবে না।"

অন্ধকারের মধ্যে বুড়োর গায়ে হাত দিয়ে সোম চুপিচুপি বলল, "কী ব্যাপার রে, কেউ আসার তো লক্ষণ দেখছি না। আমাদের আসাটা কেউ—"

হঠাৎ দুজনকে সচকিত করে হলে ঢোকার দরজায় মৃদু ঘটাং শব্দ হল। দুই বন্ধুই কথা থামিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাতের টর্চ ধরে রইল শক্ত করে। স্থির চোখে পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল। শুনতে পেল খুটখাট করে হুকটানা তালা খোলার শব্দ। তারপর সামান্য ক্যাঁচ করে দরজা ফাঁক হল। হলের মধ্যে পড়ল মৃদু আলোর রেখা। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সরু পেন্সিল-টর্চের আলোর পিছনে একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে চেনা যাচ্ছে না।

সাইড-রুমের আড়ালে বুড়ো আর সোমের চোখ জ্বলছে। খেয়াল রইল না ওরা কোথায় রয়েছে। যেন রুদ্ধশ্বাস কোনো নাটকের শেষ অঙ্কের পরিণতি দেখছে নিঃসাড়ে বসে। হলের মধ্যে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি। কয়েকটা টেবিল পেরিয়ে এসে দাঁড়াল। এক টুকরো কাগজ বার করল পকেট থেকে। টর্চের সরু আলো পড়ল কাগজের ওপর। যেন কিছু মেলাচ্ছে কাগজ দেখে। দিক পরিবর্তন করে ছায়ামূর্তি চলল পশ্চিমের দিকে যেখানে সারি সারি বন্ধ করা লকার রয়েছে। সূক্ষ্ম আলো পড়ল লকারের ওপর। কাঠের ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা সংখ্যাগুলো দেখা গেল। আলো সরে যাচ্ছে পাশাপাশি সংখ্যাগুলোর ওপর দিয়ে। আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ···ছত্রিশ নম্বরে আলোর রেখা স্থির হয়ে দাঁড়াল। বুড়ো সামান্য চাপ দিল সোমদেবের হাতে। ওদের সেই কাটা স্টম্যাক রেখে দেওয়া

লেখক সত্যজিৎ রায় কজন ?

লেখা তাঁর পুরো সময়ের কাজ নয়, কিন্তু যখনই লেখেন, যা-কিছু লেখেন—তা কেড়ে নেয় আমাদের পুরো মনোযোগ। লেখক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই চমক-জাগানো তাঁর রচনার বিষয় এবং স্বাদের বৈচিত্র্য। 'বাদশাহী আংটি' থেকে শুরু করে এ-বছর 'এবারো বারো পর্যন্ত' যে চব্বিশটি ছোটদের বই বেরিয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে, শুধু তার ওপর একবার চোখ বুলোলেই অবাক লাগে। মনে হয়, এ-সবই কি একজন স্রষ্টার রচনা ?
সত্যিই যেন হিসেব মেলে না। যিনি লেখেন গোয়েন্দা ফেলুদার নানান রহস্যভেদের দুরন্ত সব বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী, তিনিই যে প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর মতো বিজ্ঞানীর নিত্য নতুন কাণ্ডকারখানার স্রষ্টা, মেলানো যায় না। আবার 'ফটিকচাঁদ' পড়লে মনে হয়, এ যেন তৃতীয় এক লেখকের উপন্যাস। শুধু কি এইটুকুই ? না। এর পরেও থেকে যায় 'পটলবাবু ফিল্মস্টার', 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'খগম' বা 'সমাদ্দারের চাবি'র মতো অবিস্মরণীয় সব গল্প—যা ছড়িয়ে রয়েছে 'এক ডজন গপ্‌পো' এবং 'আরো এক ডজন' বইতে।

সত্যজিৎ রায়ের বই

ফেলুদা-সিরিজ ঃ হত্যাপুরী ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৮·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৮·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৮·০০ বাক্স রহস্য ৮·০০ সোনার কেল্লা ৮·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৮·০০ বাদশাহী আংটি ৮·০০ যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ৮·০০ টিনটোরেটোর যীশু ১০·০০

শঙ্কু-কাহিনী ঃ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৮·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানার ১০·০০ শঙ্কু একাই ১০০ ১২·০০

গল্পগ্রন্থ ঃ এক ডজন গপ্‌পো ১২·০০ আরো এক ডজন ১২·০০ আরো বারো ১২·০০ এবারো বারো ১২·০০

অনন্য উপন্যাস ঃ ফটিকচাঁদ ১০·০০

স্মৃতি কাহিনী ঃ যখন ছোট ছিলাম ১৫·০০

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সন্দেশ-পত্রিকার শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়ে চিরকালীন সংকলন

সেরা সন্দেশ দাম ৬০·০০

নতুন পর্যায়ে 'সন্দেশ' পত্রিকার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। নিতান্ত একটি পত্রিকা তো নয়, আশ্চর্য রকমের সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বারবার পড়বার মতো কত-যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়, এবং বারবার দেখবার মতো কত ছবি তার ইয়ত্তা নেই। কুড়ি বছরের সেইসব লেখা আর ছবির থেকেই বেছে নিয়ে, ছেঁকে নিয়ে বার করা হল অসামান্য এই সংকলন—সেরা সন্দেশ। কী আছে সেরা সন্দেশে ? উত্তরে বলতে হয় কী নেই ? রবীন্দ্রনাথের নাটিকা, শরদিন্দুর সদাশিবের কাণ্ডকাহিনী, তারাশঙ্করের গল্প, অজিত দত্তের ছড়া, সুখলতা রাওয়ের কবিতা, ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠি পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ—এমন সব দুর্লভ লেখার পাশাপাশি এ-যুগের প্রবীণ আর নবীন প্রায় প্রত্যেকের সৃষ্টি নিয়েই এই দারুণ বৈচিত্র্যময় সংকলন। শুধু গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ছড়া-শিকারকাহিনী-গোয়েন্দা উপাখ্যান—রূপকথা-অ্যাডভেনচার-ইতিহাস বা বিজ্ঞানই নয়, ম্যাজিক-ধাঁধা-হেঁয়ালি-ছবি আর শব্দের খেলা, এমন-কি কার্টুনও বাদ যায়নি। সেরা সন্দেশ সাজিয়ে দেবার কাজটা করেছেন, সত্যজিৎ রায়। অজস্র নতুন ছবি এঁকেছেন। তিনি এই সংকলনটির জন্য।

ম্যাপলিথো কাগজ, লাইনোয় ছাপা, আর্ট পেপারে প্লাস্টিক ফিনিশ জ্যাকেট, রঙীন পুস্তানি, কাপড়ে শক্ত বাঁধাই, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রায় দুশো ছবি ও প্রচ্ছদপট। পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে নতুন লেখা ও লেখক পরিচিতি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

ছত্রিশ নম্বর লকার। সোমদেবের হাত ঘামছে।

অন্ধকারে একগোছা চাবিসহ ছায়ামূর্তির হাত উঠে এল লকারের ছোট্ট চাবির গহ্বরের কাছে। পর পর কয়েকটা চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা চলল। চার-পাঁচ বারের চেষ্টায় খুলে গেল লকারের তালা। টেনে খুলল ছোট পাল্লাটা। ছায়ামূর্তি চাবির গোছা পকেটে রেখে দ্রুত একটা গ্লাভস পরে নিল ডান হাতে। তারপর ট্রেসুদ্ধ কাটা স্টম্যাক নামিয়ে নিয়ে এল। একটা উঁচু টুলের ওপর রাখল। টর্চের আলো ফেলল স্টম্যাকের কাটা জায়গাটার মধ্যে। গ্লাভস পরা হাত ঢুকিয়ে তুলে আনল সেই সোনার হার আর মোহর। মুখ নিচু করে টর্চের আলোয় ঝকঝক করে ওঠা স্বর্ণমুদ্রা আর—

ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়োদের উলটো দিকের সাইড-রুম থেকে তীব্র উজ্জ্বল আলো ঠিক যেন গনগনে আগুনের মতন গিয়ে পড়ল সোজাসুজি ছায়ামূর্তির মুখে আর হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রগম্ভীর গলায় কে বলে উঠল, "এক চুল নড়লেই গুলি করব।"

সোমদেব আর বুড়ো এত বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল দেখতে দেখতে যে নিজেদের হাতের আট ব্যাটারি টর্চ জ্বালাতেও ভুলে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর গলা শুনেই দ্রুত হাতের টর্চ জ্বালল। ততক্ষণে উলটো দিকের সাইড-রুম থেকে ডি আই জি মিস্টার রামগতি ব্যানার্জি আর কিঙ্কর দাশগুপ্ত হাতে টর্চ আর পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আর ঝলমলে আলোর সামনে হাতে সোনার হার আর মোহর নিয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে একটু আগের সেই অচেনা ছায়ামূর্তি—অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক রবিন আচার্য।

বুড়ো আর সোম দ্রুত বেরিয়ে এল ছোট ঘর থেকে। টর্চের আলো জ্বেলে এগিয়ে গেল মিস্টার ব্যানার্জির কাছে। উজ্জ্বল আলোয় তাকিয়ে দেখতে লাগল দুপুরবেলা কথা বলে আসা সেই রবিনবাবুকে, ক্রুদ্ধ লালচোখে অপমান আর নিষ্ফল প্রতিহিংসায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিঙ্কর দাশগুপ্ত তখন ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বেলে ছবি তুলে নিচ্ছেন এ-পাশ ও-পাশ থেকে।

॥ ১০ ॥

স্টম্যাকের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা আর গলার হারের রহস্য উন্মোচন হওয়ার দুদিন পরে সবাই সান্ধ্য-নিমন্ত্রণে এসেছেন বুড়োদের বাড়িতে। বুড়োর বাবাই অবশ্য সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন। সোমদেব, ওর বাবা, মা, দাদা, ডি আই জি মেসোমশাই মিস্টার ব্যানার্জি আর বুড়োর বন্ধু সুদীপ, কিঙ্কর দাশগুপ্ত, ডক্টর লাহিড়ি সবাই এসেছেন। আরও এসেছেন বুড়োদের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের আর্টিস্ট বিশ্বনাথ কর এবং ব্যারিস্টার প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী। সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছেন দুটো বড় টেবিল জোড়া লাগিয়ে। পরিবেশন করছেন বুড়োর মা আর দুই দিদি।

বুড়ো ইতিমধ্যেই প্রথম থেকে যা-যা ঘটনা ঘটেছিল সবই বেশ গুছিয়ে বলেছে। যেখানে যেখানে বাদ পড়ছিল, সোমদেব ওকে ধরিয়ে দিচ্ছিল।

বিশ্বনাথবাবু একটা চিকেনের পা চিবোতে চিবোতে বুড়োকে বললেন, "আপনারা তো আমাকে প্রায় জেলে ঢুকিয়েছিলেন দেখছি, অ্যাঁ! সুভাষগ্রামে যদি আমার বোন আর ভগ্নীপতি না থাকত এবং ওদের যদি গাড়ি না থাকত, তা হলেই আমি গিয়েছিলাম আর কি।"

সবাই হেসে উঠলেন ভদ্রলোকের কথায়।

বুড়ো বলল, "আমি কিন্তু রবিনবাবুর বাড়িতে চিঠি লেখার প্যাডের কাগজটা দেখেই প্রথম সন্দেহ করি। তারপর কায়দা করে সেটা ঠিকানা লেখার নাম করে প পুরে নিই। তখন অবশ্য আদৌ শিওর হইনি।"

সোমদেবের দাদা বাসুদেব বলল, "অ কী কী প্রমাণ পেয়েছিলি পরে?"

বুড়ো ওর তখনও পকেটে রাখা একটা ডট পেনের ঢাকনা বার করে দেখাল। বলল, "এই যে, আসল যেটা পাওয়ার পরে বুঝেছিলাম রবিনবাবু এর মধ্যে রয়েছেন। ডিসেকশন হলে আমাদের বডির সামনে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

ডক্টর লাহিড়ি বললেন, "থাক বাবা, এখন খাওয়া-দাওয়ার সময় তোমরা ডিসেকশন হলের কথা তুলো না। যা করেছ যথেষ্ট।"

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন, "আমি অবশ্য ওদের বকাবকি করেছি এতটা রিস্ক নেওয়ার জন্য। তবে, ডক্টর লাহিড়ি, তোমার ডিপার্টমেন্টে কিন্তু একটা দুর্নীতির রাজত্ব চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এখন সেটা ধরা পড়ার পুরো ক্রেডিট ওদের দুজনকে দিতে হবে।"

ব্যারিস্টার প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় বুড়োর আর সোমদেবের বাবাকে বললেন, "আমি কিন্তু ওদের দুই বন্ধুকে দুটো প্রেজেন্টেশন দেব, আপনারা আপত্তি করবেন না।"

বিশ্বনাথ কর বললেন, "আর আমি সেই স্টম্যাক আঁকা ছবিটা ওদের দিয়ে দেব। ও জিনিস আমি আর আমার কাছে রাখছি না। বরং ওদের পড়াশুনায় কাজে লাগবে।"

আবার হেসে উঠলেন সকলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বুড়ো আর সোমের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন। বললেন, "সোনার হারটা আমার খুব সেন্টিমেন্টের জিনিস—ওটা আমার মায়ের। ফিরে পাব ভাবিনি। তোমরা বড় হও বাবা।"

বুড়ো বলল, "আমরা কিন্তু দুটো লোকের কাছে কৃতজ্ঞ। এক হচ্ছে তিলজলার সেই গুণ্ডাটা, যে সব বলে দিয়েছিল। আর হচ্ছে আমাদের হেড ডোম ঝগড়ু।" তারপর মিস্টার ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, "অবশ্য মেসোমশাই কলকাতায় না থাকলে আমাদের কোনো কাজই হত না।"

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন, "খুব হয়েছে। এবার সত্যানুসন্ধান ছেড়ে পড়াশুনো করো মন দিয়ে।"

সুদীপ চলে যাওয়ার আগে বুড়োর কাছে এসে বলল—"ধ্যুত, এখন আমার মনে হচ্ছে ফিজিক্সে অনার্স না পড়ে মেডিক্যাল পড়লেই ভাল হত।"

একে একে সকলে বুড়োদের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বুড়ো শুধু একেবারে শেষে সোমদেবকে বলল, "বাকি ক্লুগুলো তুই রাত্তিরে ভাব। পরে আমি বলব। একটু চেষ্টা করলে অবশ্য তুই নিজেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবি।" (সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছত্রপতির বংশধর

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

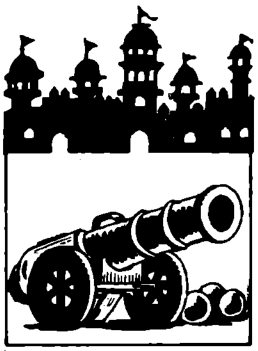

ছত্রপতি শিবাজি খুব বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই ছেলে তাঁর এই গুণ পাননি। শিবাজি বেশিদিন বাঁচেননি। কোন্ সালে তাঁর জন্ম, তাও ঠিক করে বলা চলে না। ১৬২৭ হতে পারে, আবার কারও মতে ১৬৩০ সাল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স প্রায় ষাট, কিংবা ষাটের একটু বেশি হয়েছিল। আওরঙ্গজেব আরও আঠারো বছর বেঁচে ছিলেন। শিবাজির বড় ছেলে শম্ভাজি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁর আর কোনো গুণ ছিল না। অনেকে বলত, তাঁর একজন বন্ধুর কুপরামর্শে তিনি অধঃপাতে যাচ্ছিলেন। বন্ধুটির উপাধি ছিল 'কবিকুলেশ' অর্থাৎ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখনকার লোকরা একটু বদল করে বলত 'কবিকলুষ', অর্থাৎ 'পাপের কবি'। ন'বছর রাজত্ব করার পর শম্ভাজি আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতির হাতে ধরা পড়লেন। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে। তাঁকে এবং তাঁর বন্ধুকে আওরঙ্গজেবের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সম্রাটের সামনে তাঁদের মেরে ফেলা হল। এরপর শিবাজির ছোট ছেলে রাজারাম রাজ্যশাসনের ভার নিলেন। রাজারাম ঠিক রাজা নন, রাজার প্রতিনিধিমাত্র। শম্ভাজির ছেলে শাহু মোগল-শিবির থেকে যদি ফিরে আসেন, তিনিই রাজা হবেন।

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে আর দিল্লি ফিরে যেতে পারেননি। আহ্‌মেদনগরের কাছে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন ১৭০৭ সাল। ইতিমধ্যে মারাঠা অশ্বারোহীরা মোগল সাম্রাজ্যে ঢুকে খুব উৎপাত আরম্ভ করেছিল। মোগল সেনাপতি জুলফিকার খাঁ শাহুকে মুক্ত করে দিলে ফল খারাপ হবে না। মারাঠারা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ছেলে মুয়াজ্জেম তখন প্রথম বাহাদুর শাহ নামে সিংহাসনে বসেছেন। মুক্তি পাবার সময় শাহু অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি মোগলের বশম্বদ হয়ে থাকবেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজারামেরও দিন শেষ হয়ে এসেছিল। জালনা দুর্গ থেকে মোগল সৈন্যের তাড়া খেয়ে পালিয়ে তিনি সিংহগড়ে এসে পৌঁছলেন। সেখানে মাসখানেক অসুস্থ থাকার পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

জুলফিকার খাঁ যা ভেবেছিলেন তাই হল। রাজারামের বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ রাজ্যের উপর দাবি ছাড়লেন না। শম্ভাজির দুষ্কৃতির ফলে সিংহাসনের উপর শাহুর দাবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ শাহুর পক্ষে ছিলেন। প্রধানত তাঁর সাহায্যে শাহু ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। তারাবাঈ নিজের জায়গা রাখতে পারলেন না। তিনি সাতারার দুর্গে প্রায় বন্দিনীর মতো থাকতে লাগলেন। শাহুর ছেলে ছিল না। তিনি দত্তক নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারাবাঈ বলে পাঠালেন যে, তাঁর নিজের বংশেরই তো একজন আছে, সেই হবে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তারও নাম রাজারাম। তারাবাঈ বললেন, তাকে খুব অল্প বয়স থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সে এতদিন এক গন্ধানি পরিবারে মানুষ হয়েছে। গন্ধানিদের পেশা হচ্ছে নাচ-গান করা। তরুণ রাজারামকে সাতারায় আনা হল। সাতারা দুর্গের নীচে তাঁর প্রাসাদ। তারাবাঈ তো স্বামীর নাম ধরে তাঁকে ডাকতে পারেন না, কাজেই তাঁর নাম একটু বদলে তাঁকে বলা হত রামরাজা। কিন্তু তাঁকে দিয়ে তারাবাঈয়ের ইচ্ছাপূরণ হল না। পেশোয়ার সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিল না।

তারাবাঈ এতে ভীষণ রেগে গেলেন। রামরাজা ও তাঁর স্ত্রীকে চম্পাষষ্ঠী ব্রত উপলক্ষে দুর্গে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন তিনি। খাওয়া-দাওয়া ভালই হল, কিন্তু রামরাজা দুর্গ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে দেখলেন যে, তারাবাঈয়ের হুকুমে দুর্গের সব দরজা বন্ধ। বের হবার উপায় নেই। কেউ-কেউ বলেছেন, রামরাজার উচিত ছিল রক্ষীদের আক্রমণ করা। তারা নিশ্চয়ই শিবাজির বংশধরকে বাধা দিতে সাহস পেত না, দরজা খুলে দিত। এ-কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু রামরাজা সে-ধরনের মানুষ ছিলেন না। তার বদলে তিনি তারাবাঈকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন যে, তাঁর এ-রকম ব্যবহারের কারণ কী? তারাবাঈ দেখা করলেন না।

রামরাজার আর নিজের প্রাসাদে ফিরে যাওয়া হল না। তিনি সস্ত্রীক সাতারায় থাকতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে এই পরিবেশের সঙ্গেই মানিয়ে নিতেও শিখলেন। তারাবাঈয়ের মৃত্যুর পরে রামরাজার অবস্থার উন্নতি হল, কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেবার কথা কারও মনে হল না। সাতারায় বন্দী অবস্থায় থাকার সময় রামরাজা ও তাঁর বংশধররা শুনতেন যে, তাঁর সৈন্যরা সর্বত্র জয়ী হচ্ছে। তাঁর অশ্বারোহীরা পাঞ্জাব অতিক্রম করে গিয়েছে, মারাঠারাই উত্তর ভারতবর্ষের অধীশ্বর। পেশোয়া বছরে একবার এসে তাঁর কাছ থেকে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের অনুমতি নিয়ে যেতেন। দুর্গের মধ্যে বসে শিবাজির বংশধর রাজ্যশাসনের খেলা খেলতেন।

রামরাজা ২৭-২৮ বছর এইরকম রাজা-রাজা খেলা খেললেন। তাঁর ছেলে ছিল না বলে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। নাম রেখেছিলেন দ্বিতীয় শাহু। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭৭৭ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইংরেজরা যখন দক্ষিণ ভারতে খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮১০ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়া তখন ইংরেজদের কাছে হেরে গিয়েছেন। ১৮০২ সালে বেসিনের সন্ধির ফলে পেশোয়ার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। তাহলেও পেশোয়া প্রকৃতপক্ষে সাতারার রাজার প্রভু। সামান্য ব্যাপারেও রাজাকে পেশোয়ার কৃপার উপর নির্ভর করতে হত। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয় পেশোয়ার মর্জির উপরে। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রাজার কর্মচারীদের পেশোয়া নিয়োগ করতেন। তাঁদের উপর রাজার ক্ষমতা সবসময় খাটত না। এমনও হয়েছে যে, রাজা

তাঁদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে পেশোয়া সে-শাস্তি মকুব করে দিয়েছেন। একবার রাজার ইচ্ছা হল দুজন নর্তকীকে মাইনে দিয়ে রাখবেন। প্রত্যেকের মাইনে মাসিক চল্লিশ টাকা। পেশোয়া সম্মতি দিয়েছিলেন। আর একবার রাজপ্রাসাদে জল আনবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। খরচ বেশি পড়বে বলে পেশোয়া এই ব্যবস্থা নাকচ করে দেন।

১৮১০ সাল থেকে সাতারার রাজা হলেন প্রতাপসিং। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ১৮১৭ সালে পুনে থেকে পালিয়ে গেলেন। পালাবার সময় সাতারা দুর্গ থেকে রাজা প্রতাপসিং ও তাঁর পরিবারের কাউকে-কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তার কারণ স্পষ্ট। ইংরেজরা যদি এই সুযোগে প্রতাপসিংকে মারাঠাদের রাজা বলে ঘোষণা করেন, তাহলে পেশোয়া অসুবিধেয় পড়ে যাবেন। এইভাবে কয়েক মাস ধরে ইংরেজ সৈন্যের কাছে হঠে গিয়ে পালাতে পালাতে ১৮১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশোয়ার সর্বনাশ হয়ে গেল। অষ্টির যুদ্ধে তাঁর সেনাপতি বাপু গোকলা, যাঁর উপর তাঁর সব আশা-ভরসা ছিল, মারা গেলেন। প্রতাপসিংকে ফেলে বাজিরাও পালিয়ে গেলেন। তাঁর ফেলে-যাওয়া এক কোটি টাকাও ইংরেজদের হাতে এল। এলফিনস্টোনের কাছে সাতারার রাজাকে রেখে জেনারেল স্মিথ পেশোয়াকে আবার তাড়া করে বেড়াতে লাগলেন। প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এলফিনস্টোন লিখলেন, প্রতাপসিংয়ের আচরণ স্বাধীন রাজার মতো। এলফিনস্টোনকে দেখে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না, নিচু হয়ে অভিবাদনও করলেন না। তাঁর ব্যবহার খুব ভদ্র, কথাবার্তা মার্জিত। তিনি দেখতে সুপুরুষ নন, বরং তাঁর ভাই তাঁর চাইতে দেখতে ভাল। তবে দুজনের চেহারার মিল আছে। তাঁদের মাকে দেখে এলফিনস্টোনের মনে হল, তিনি খুব বুদ্ধিমতী। একসময় সুরূপা ছিলেন বোঝা যায়। পেশোয়ার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতাপসিং খুব আনন্দিত হয়েছেন বোঝা গেল। এপ্রিলের ১০ তারিখে সাতারায় প্রতাপসিংয়ের অভিষেক হল।

প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে প্রথম দিকে ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল। এল্‌ফিনস্টোন তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। বন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁকে সবচেয়ে সভ্য মহারাষ্ট্রীয় বলে বর্ণনা করেছেন। ভেলভেটে মোড়া টেবিলের একদিকে বসে সাতারার রাজা নিজের হাতে চিঠি লিখছেন এবং অন্যান্য কাজ করছেন। এলফিনস্টোনের মনে হয়েছিল, এই দৃশ্য দেখলে শিবাজি কী ভাবতেন! এলফিনস্টোন বলেছেন, প্রতাপসিং যে-ভাবে রাজ্যশাসন করছেন তা যে-কোনো ইউরোপীয়ের পক্ষেই গর্বের বিষয় হত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্‌স কানিংহাম গ্রান্ট ডাফ প্রায় তিন বছর সাতারার রাজার অভিভাবকের কাজ করেছেন। তিনি এই কাজ থেকে অবসর নেবার পর এলেন ক্যাপ্টেন ব্রিগ্‌স। তিনিও পরে ঐতিহাসিক হয়েছিলেন। প্রতাপসিং মহাবলেশ্বরে যাবার জন্য একটি পথ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয়দের জন্য সেখানে একটি গ্রীষ্মাবাস। তার বদলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতাপগড়ের বিখ্যাত শিবাজির ভবানী-মূর্তি রাজাকে ফেরত দিয়েছিলেন। তাঁর লেখাপড়ায় উৎসাহ ছিল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

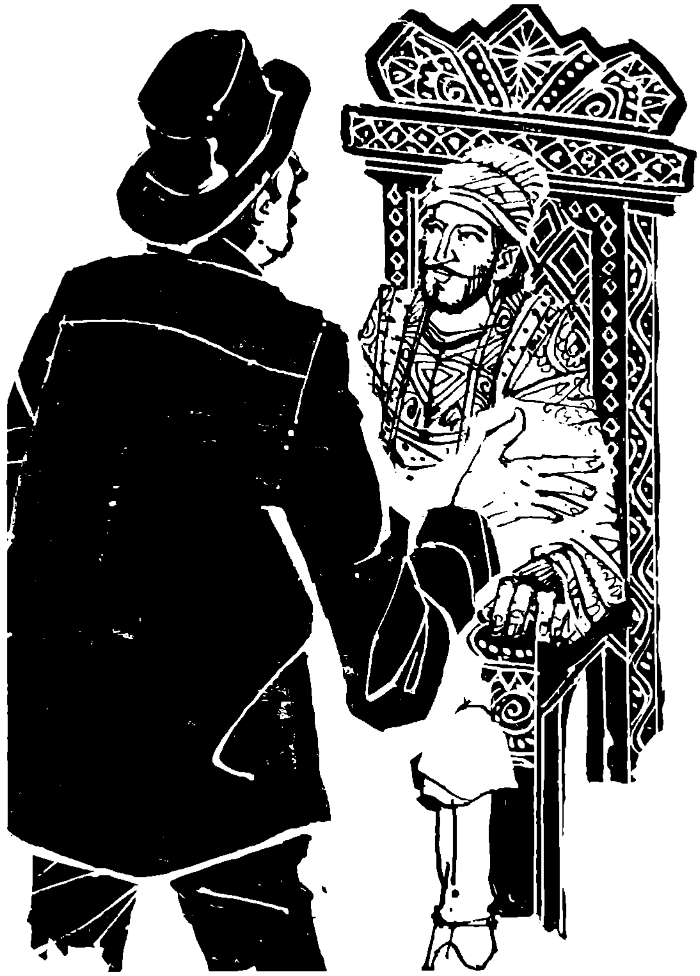

কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে সদ্ভাব স্থায়ী হল না। কেউ-কেউ বলতে লাগলেন, তিনি কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। একবার খবর এসেছিল, প্রতাপসিং ও বিঠুরের নির্বাসিত পেশোয়া বাজিরাও ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছেন। তখন কিন্তু এই কথা কেউ বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যে-কারণেই হোক, অবশেষে প্রতাপসিংয়ের রাজত্ব গেল। ১৮৩৯ সালে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর ভাই শাহজিকে রাজা করা হল।

প্রতাপসিংয়ের রাজ্য যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। কাগজপত্রসমেত ইংল্যাণ্ডে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দূতদের একজন দরকারি কাগজপত্র আর অনেক টাকা নিয়ে অন্তর্ধান করেছিলেন। প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে কোম্পানি ভাল ব্যবহার করেনি। যে ইংরেজ কর্মচারী তাঁকে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সমস্ত পথ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। প্রতাপসিং কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েননি। জর্জ টমসন নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিককে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। তখনকার দিনে জর্জ টমসনকে অনেকে জানত। কিন্তু তাতে কিছু কাজ হল না। বারাণসীতে অবহেলার মধ্যে শিবাজির বংশধরের মৃত্যু হল। প্রতাপসিংয়ের ভাই শাহজির মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সাতারা ইংরেজদের হাতে এসে যায়। শিবাজির রাজত্বের আর কোনো চিহ্ন রইল না।

ছবি : অনুপ রায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টিয়াপাখি

ও টিয়াপাখি
উড়ে গেলি নাকি ?

★

বেরিয়ে দেখি
বৃষ্টিখানা থামল নাকি !

শৌভিক চৌধুরী (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে **অপরাজিতা সেনগুপ্ত** (বয়স ৭)

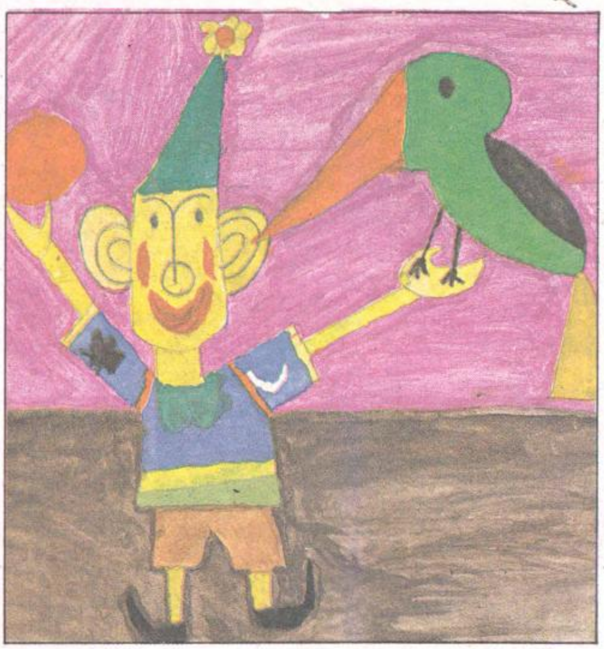

ছবি এঁকেছে **শীর্ষেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়** (বয়স ৮)

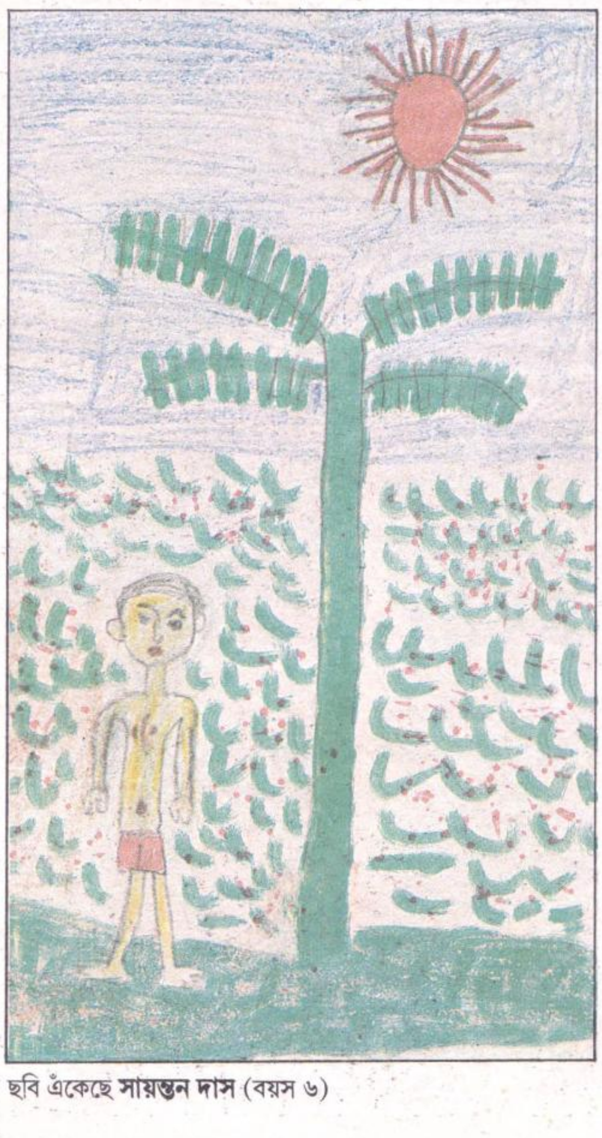

ছবি এঁকেছে **জিপসি সেনগুপ্ত** (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **সায়ন্তন দাস** (বয়স ৬)

আলো দিয়ে যাও

ভারত-আকাশ হল রক্তরাঙা
দারুণ খবর এল হৃদয়ভাঙা
হিংসার করাল হাত হানা দিল তব প্রাণে
ধূপসুগন্ধ ছড়িয়েছিলে মধুর আহ্বানে
সফদরজং রোডে ছিল আততায়ী
তোমার রক্ত ঝরিয়ে তারা দেশের কাছে দায়ী
ভারতবাসীর প্রার্থনা হল ব্যর্থ
দেখেছিলে তুমি এক-ভারতের স্বার্থ
চলে গেছ তাই আকাশ বাতাস স্তব্ধ
শান্তিবনও হয়েছে নিঃশব্দ
জগৎসভায় তুলে ধরেছিলে দেশের মান
আলো দিয়ে যাও প্রিয়দর্শিনী মহাপ্রাণ।

ভাস্বতী ভট্টাচার্য (বয়স ১২)

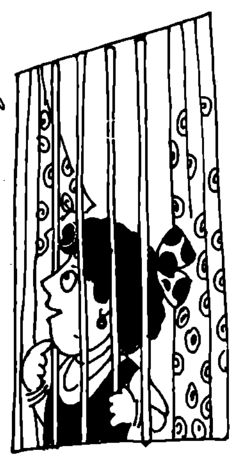

ঝড়-বৃষ্টি হলে

বিকেলবেলায় এল রে ঝড়
আকাশ-বাতাস জুড়ে,
ঘরের ভিতর জানলা দিয়ে
দেখছি অনেক দূরে।
ঝড়ের মতন গাছের ডালে
উড়ছে পথের ধুলো,
মেঘের ভেলায় বর্ষা এল
ভিজছে রে কাকগুলো।
বাইরে যাওয়া বারণ আছে
ঘরের ভিতর তাই,
ভাবছি কেবল আপন মনে
কখন বাইরে যাই।
পড়তে আমার মন বসে না
ঝড়-বৃষ্টি হলে,
দেখতে-দেখতে আমার মন
বাইরে যায় রে চলে।

ঋতশ্রী চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১২)

তাতুর জন্মদিন

তাতুর দাদা কানু ও শম্ভু ঠিক করেছে যে, এবার তাদের ছোট বোনের জন্মদিনে তারা ম্যাজিক দেখাবে।

জন্মদিনের দিন ঠিক হল বসার ঘরে ম্যাজিক দেখানো হবে। এক দিকে একটা লম্বা টেবিলের ওপর চাদর পাতা আছে। চাদরটি মাটি পর্যন্ত ঝোলানো।

শম্ভু ও কানু হরেকরকম ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। যেমন, লেবু কাটলে রক্ত বার হয়। শম্ভুর বুকে ছুরি বসালেও সে মরে না। তার ওপর আবার নানারকম তাসের ম্যাজিক।

কিন্তু জল অদৃশ্য করার ম্যাজিকটা নিয়েই গণ্ডগোল দেখা দিল। অনেকক্ষণ থেকেই শম্ভুকে দেখা যাচ্ছিল না। সবাই ভাবল, ও বুঝি মিষ্টি খেতে গেছে। কানু দু'বার 'শম্ভু, শম্ভু' করে ডেকেও যখন সাড়া পেল না, তখন সে একাই ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করল।

কানু গেলাসের পর গেলাস জল ঢালতে থাকল, এবং সে জলও বেমালুম অদৃশ্য হতে লাগল। হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে স্বয়ং শম্ভু ফুড়ুত করে বেরিয়ে এসে বলল, "না কানুদা, আর পারব না, পাঁচ গেলাস জল খেয়েছি আর কত খাব ?"

সঞ্জয় রায় (বয়স ১৩)

খেলার সময় ভাব

কিছুদিন আগে আমরা বিহারের জামতাড়া মিশনে গিয়েছিলাম। আশ্রমটি খুব সুন্দর সাজানো, ট্রেন-লাইনের ধারে।

আশ্রমে একটি কুকুর থাকত, তার নাম বাঘা। লিচুগাছের নীচে তার থাকার জন্যে ছোট্ট একটা ঘর ছিল। আমরা যেতেই কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠেছিল।

মিশনের মহারাজ বাঘাকে খুব ভালবাসতেন। বাঘাও মহারাজকে খুব ভালবাসত। বাঘা দুপুরবেলা মাংস-ভাত খেত, তখন কেউ ওর সামনে গেলেই ও রেগে যেত। ওর একটা বল ছিল, আমার সঙ্গে ও বল খেলত ; কিন্তু বাঘার সঙ্গে আমার তেমন ভাব হয়নি। ও আমাকে শুধু তার খেলার সঙ্গী ভাবত বোধহয়।

উপালি সমাদ্দার (বয়স ৮)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

আমাকে অনেকেই অনুরোধ করেছেন যেন আমি এই গল্প বলা না থামাই। ক্রিকেটের গল্পগুলো তাঁদের নাকি চমৎকার লাগছে। যাঁরা আমাকে এই অনুরোধ করেছেন, একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাঁদের মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। যত লোককে মনে করতে পারলাম, ও মা, দেখি সকলেই বয়স্ক লোক। ছোট্ট বন্ধুরা কেউ নেই। সুতরাং মনটা খারাপ লাগল। কই, তোমরা তো কিছু বলছ না। আমি এই গল্পগুলো তো আর বড়দের জন্য বলতে বসিনি। এগুলো কেবল তোমাদের জন্য। ভেবে হাসি পেল, ছোটদের পত্রিকা হয়েও 'আনন্দমেলা' বড়দের কাছেও দারুণ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তাঁরা গোগ্রাসে পত্রিকাটি গিলছেন। ভাবলাম, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ব্যাপারটা চিঠিতে জানানো যাক। পরে আর লিখলাম না। সম্পাদক কি আর এটা টের পান না ? নিশ্চয়ই পান। কিন্তু তোমরা টের পাও কি ? আমার ধারণা, বাড়িতে পত্রিকা পৌঁছলে বড়রা তোমাদের আগেই বেশ খানিকটা পড়ে নেন। হয়তো সেই সময়ে পড়াশুনো নিয়ে তোমরা ব্যস্ত।

ছোটবেলায় কথকঠাকুরের সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ বড় ভাল লাগত। দুলে দুলে কেমন পড়তেন তিনি। হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে তিনি যখন পাঠ করতেন, আমার দারুণ লাগত। তারপর অনেকক্ষণ পড়ার পর যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নিতেন। আমার অবস্থা এখন ক্লান্ত কথকঠাকুরের মতো। কম দিন ধরে তো আর বকবক করছি না। গল্পের স্টক এখনও অনেক মজুত। তবে 'বয়স হয়েছে', এই ব্যাপারটাকে চাইলেও উপেক্ষা করতে পারি না। গল্প কতটুকুই বা তোমাদের বলতে পেরেছি ? খুবই সামান্য। সত্যি কথা বলতে কী, ঝুড়ি ভর্তি গল্পের এক-দশমাংশও বলা হয়নি। কিছুদিন আগে একজন আমাকে ধরল। এই লেখা নিয়েই কথাবার্তা হল।

"গল্পগুলো বেশ লাগছে। তবে আপনি কি শুধু গল্প বলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলম ধরেছেন ?"

"ঠিক তাই। একদম গল্প করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"ভাল কথা। তা বলে রণজি ক্রিকেটের কথা, বাংলার ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের কথা, সিলেকটার হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা, এগুলো তো বললেন না।"

"লেখা শুরু করার সময় বলেছিলাম, শুধু টেস্ট ক্রিকেটে আমার নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখব। সব সময় সে শর্ত আমি অবশ্য পালন করতে পারিনি। একটা ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র থাকার ফলে অন্য ঘটনার কথাও লেখার মধ্যে এসে গেছে। আনতে হয়েছে। তাতে বোধহয় আমার মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বাংলার ক্রিকেট বা রণজি ট্রফির কথা ভাল করে বলতে হলে, সব মিলিয়ে একটা মহাভারত হয়ে যেত। আর রাজনীতি এবং পৃষ্ঠপোষকতার নোংরামি থেকে দূরে থাকব বলে ইচ্ছে করেই সিলেকশানের ঘটনাগুলো বলিনি। এটাকে একটা নির্মল, আনন্দময় গল্পের আসর করে তুলব ভেবেই আমার এভাবে চলা।"

লোকটি চুপ করে রইল। হয়তো আমার যুক্তিকে ঠিকমতো বুঝতে পেরেছিল, তাই। বাংলা এবং রণজি ক্রিকেটের কথা বিস্তৃতভাবে বলতে পারলে ভাল হত। তবে নেহাতই গল্প করার জন্য আন্তর্জাতিক আঙিনাকে বেছে নিয়েছিলাম। তবু স্মৃতিকথা স্মৃতিকথাই। তাতে কোনো কিছু বাদ যাওয়া উচিত নয়। যতটা সম্ভব, মানে যতটা মনে করে লেখা যায়, লেখা উচিত। হয়তো লিখবও। তবে এখনই নয়। ধীরেসুস্থে।

বুঝতে পারছ বোধহয়, কেন এমন করে বলছি। হ্যাঁ, স্মৃতিকথার প্রথম পর্ব এখানেই শেষ। বলছিলাম না, আমার অবস্থা এখন ক্লান্ত কথকঠাকুরের মতো। বুড়ো মানুষটার একটু বিশ্রাম দরকার। তাই ক্ষান্ত হচ্ছি স্মৃতিকথনে।

একটা কথা বলি। আমার এই গল্প বলার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, তোমাদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলা। দুই, মহান ক্রিকেটারদের গল্প বলে তোমাদের অনুপ্রাণিত করা। বড় হওয়ার (খ্যাতিতে নয়) যেমন কতগুলো মজা আছে, ঝামেলাও কম নয়। তোমরা যখন বড় হবে, তখন সে-সব বুঝতে পারবে। তোমরা এখন এমন একটা বয়েসে আছ, যেখানে চিন্তা কম, ভার কম। আনন্দ অনেক বেশি। আমার সেই বয়সটা আমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। সংসারের জটিল আবর্তে পড়ে বদলে গেছে সব কিছু। তোমাদের সঙ্গে গল্প করে আমি নিজেই নিজের ছেলেবেলাকে ফের অনুভব করতে পারছিলাম। আহ্, কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। এই ক'দিন আমি নিজেকেই বোধহয় সব চাইতে বেশি আনন্দ দিতে পেরেছি। তোমাদের সঙ্গে মিশে সেটাই আমার পাওয়া।

তোমাদের কাছে যে জিনিসটা আমি চাই, তা হচ্ছে তোমরা বড় হও। বিশ্ব-ক্রিকেটের ইতিহাসে তোমরাও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠো, মহান ক্রিকেটারদের মতো। যেন তোমাদের কথাও দেশে-দেশে সকলের মুখে অন্তত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আমার বড় আক্ষেপ, ভারতীয় ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চলীয় ক্রিকেটারের সংখ্যা কম। কেন আর-একটা গাওস্কর বাংলাদেশ থেকে আসবে না ? কেন আর-এক ওরেল জন্মাবে না বাংলার মুখ আরও উজ্জ্বল করতে ?

সকলের মধ্যেই ঈশ্বর সম্ভাবনার বীজ দিয়ে দেন। পরিশ্রম, অনুশীলন, অধ্যবসায়ে সেই বীজ থেকে গাছ হয়। তাতে ফুল ফোটে, ফল হয়। ফুলের গন্ধে মানুষ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ফলের স্বাদে তৃপ্ত হয়। তাই অনুশীলনে কখনও ফাঁকি দেবে না। পরিশ্রমে যেন খামতি না থাকে। কোচের কথা ঠিক ঠিকভাবে মেনে নিরন্তর শ্রম করে নিজেকে তৈরি করো। দেখবে, ফল একদিন ঠিক পাবে। পাবেই। কোনো রাজনীতি, কোনো চক্রান্ত, কোনো কিছুই তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। চূড়ান্ত দক্ষতাকে কেউ কোনোদিন অস্বীকার করতে পারেনি। পারবে না।

(সমাপ্ত)

প্রতিযোগিতায় প্রথম গুলি

সোমা দত্ত

বেলগাছিয়ার নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে যেদিন প্রথম বন্দুকের ট্রিগার টিপি, মনে আছে—ভয়ে সেদিন থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম। বন্দুকটা ফেলে দিয়েই সেদিন দু-হাত দিয়ে দু-কান চেপে ধরেছিলাম। জীবনে প্রথম কোনো ঘটনা কি কখনও ভোলা যায়? ওলিম্পিকের আসরেও যখন প্রথম গুলিটা ছুঁড়লাম, প্রথমদিনের মতো তখনও উত্তেজনায় কেঁপেছি।

ল্যানি পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, "নার্ভাস হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু তুমিই এবার প্রথম ওলিম্পিকে নামছ, তা নয়। তোমার মতো সকলেরই এক দশা। প্রত্যেকেই নার্ভাস থাকবে। আর এই সুবিধাটাকে তোমার কাজে লাগাতে হবে।"

কিন্তু এ-সব কথা তখন আমার মাথায় নেই। প্র্যাকটিস আর কম্পিটিশনের মধ্যে যে কী পার্থক্য, তখন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। আগের দিন অর্থাৎ তিরিশে জুলাইও রেঞ্জে প্র্যাকটিস করে গেছি। একেবারে নির্ভাবনায়। সেদিনও রাইফেলটাকে আমার যথেষ্ট বিশ্বস্ত মনে হয়েছে। চারশো পয়েন্টের মধ্যে করেছি ৩৯০ পয়েন্ট। নিজের ওপর বিশ্বাস তখন আমার তুঙ্গে। শুধু আমিই নই, রেঞ্জের সবাইয়ের ধারণা ছিল, একটা পদক পাচ্ছিই। রোজ প্র্যাকটিসে যাবার জন্য সবাই আমাকে চিনে গিয়েছিলেন। এমনকী আমার বাবা-মাকেও। কোন্‌দিন কী স্কোর করছি, তাও ওরা মুখস্থ রাখতেন।

এমনও হত, গেট দিয়ে ঢোকার সময় যখন চেকিং হত, সিকিওরিটি গার্ড বা অন্যান্যরা বাবা-মাকে দেখলেই বলতেন, "আপনার মেয়ে তো আজ ভাল স্কোর করেছে প্র্যাকটিসে। মেডেল পেলে দয়া করে সুভেনির দিয়ে যাবেন।" বাবা-মা ভিতরে এসে আমাকে বলতেন, "কী রে হামু, আজ নাকি প্র্যাকটিসে ৩৯২ করেছিস?" আমি অবাক হয়ে যেতাম। ওঁরা আমার স্কোর জানতে পারছেন কী করে? মা-বাবা এই রহস্যটা কিন্তু প্রথম প্রথম বেশ কয়েকদিন আমার কাছে ভাঙেননি।

আমার প্র্যাকটিস দেখে ল্যানিও আশা করছিলেন, আমি শূন্য হাতে হয়তো ফিরব না। আমার মনঃসংযোগ যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য কম্পিটিশনের দিন-তিনেক আগেই ভিলেজ থেকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। বিদেশী কোচরা কত খুঁটিনাটিই না লক্ষ রাখেন! কথায়-কথায় একদিন ল্যানিকে বলেছিলাম, "ভিলেজে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে।"

উনি প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

বললাম, "যাদের সঙ্গে এক ঘরে আছি, অনেক রাত পর্যন্ত তারা গল্পগুজব করে। হৈ-চৈ করে। আমার ঘুম আসে না। তাছাড়া ঘরের দরজা সারা রাত হাট করে রাখে। দরজার পাশেই আমার বেড। অস্বস্তিতে ঘুমোতে পারি না।"

এসব ঝামেলা এড়াবার জন্য হোটেলে থাকব কি না, মা-বাবাকে সে ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছিলাম। তা, ল্যানি সব শুনে বললেন, "কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি আমার সঙ্গেই হোটেলে থাকবে চলো।" আমাদের টিমের শ্যেফ দ্য মিশন দয়া সিং সাঁধু শুটিংয়েরই লোক। ওঁকে সব গুছিয়ে বলতেই হোটেলে থাকার পারমিশন দিয়েছিলেন।

কম্পিটিশনের আগের তিন দিন হোটেলে থাকার জন্য আমার খুব উপকার হয়েছিল। সারাদিন ল্যানি রেঞ্জে খাটিয়ে মারতেন।

৩১ জুলাই ছিল আমার প্রথম কম্পিটিশন—এয়ার রাইফেলে। আমার প্রিয় ইভেন্ট। শুটিং সম্পর্কে তোমাদের অনেকেরই কোনো ধারণা নেই। এয়ার রাইফেল ইভেন্টে টার্গেট থাকে দশ মিটার দূরত্বে। তোমাকে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে হবে টার্গেট লক্ষ করে। মোট চল্লিশটা গুলি। একেকটা গুলির জন্য দশটা করে পয়েন্ট। তাহলে মোট পয়েন্ট হল চারশো। যে বেশি পয়েন্ট পাবে, ব্যস্, সে-ই চ্যাম্পিয়ন।

আমাদের দেশে যেভাবে কম্পিটিশন হয়, ওলিম্পিকের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। ওলিম্পিকে সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। আমার অবশ্য প্রি-ওলিম্পিকের সময়ই সব দেখা ছিল। একটা গুলি ছোঁড়ার পর ওখানে এমন ব্যবস্থা যে, টার্গেটটা সুইচ টিপে নিয়ে আসা যায়। প্রত্যেক প্রতিযোগীর পেছনেই একজন করে অবজার্ভার বসে আছেন। গুলি ছোঁড়ার পর তিনি সুইচ টিপে টার্গেট নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। আর টুকে রাখবেন এক থেকে ১০-এর মধ্যে কত নম্বরে গুলি লেগেছে। চল্লিশটা গুলি ছোঁড়ার পর পয়েন্ট গুনে মোট স্কোর তিনিই জানিয়ে দেবেন।

আমার কম্পিটিশন শুরু সকাল সাড়ে-নটায়। ল্যানির সঙ্গে চিনো-তে পৌঁছলাম ঘণ্টা-দুয়েক আগেই। জানতাম, বাবা-মা শুটিং শুরুর আগে কখনোই আসবেন না। ন্যাশনালের সময়ও আমি চাই না, ওঁরা দেখতে আসুন। আসলে বাবা-মা রেঞ্জে এলেই মন সেদিকে চলে যায়। এয়ার রাইফেল ইভেন্টের জন্য বরাদ্দ সময় দু-ঘণ্টা। তার মানে বেলা সাড়ে-এগারোটার মধ্যেই সব শেষ। আমরা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন নিরলস সাধনা করেছি—শুধু মাত্র ওই দেড়-দু-ঘণ্টা পরীক্ষা দেবার জন্যই। কার্ডে দেখলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বত্রিশ জন। এদের মধ্যে প্যাট স্পার্জিন বলে একটি আমেরিকান মেয়েও ছিল। ল্যানির কাছে একসময় ট্রেনিং নিয়েছিল। ল্যানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, স্পার্জিন নাকি ভাল স্কোর করছে।

টেক্সাস থেকে 'এলে' গুলি নিয়ে গিয়েছিলাম। সে-সব নিয়ে তো রেঞ্জের ভেতরে ঢুকলাম। সার-সার তেত্রিশটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। আমি রয়েছি মাঝামাঝি। আর আমারও ডানদিকে স্পার্জিন। শুটাররা বলেন, এয়ার রাইফেল নিখুঁত লক্ষ্যভেদের খেলা—হৃদ্‌যন্ত্রের সামান্যতম শব্দও মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সত্যি বলছি, হৃদ্‌যন্ত্রের ধক্‌ধকানিটা তখন হাতুড়ি পেটাইয়ের মতো মনে হচ্ছিল। তখন আমরা রেঞ্জ অফিসারের

নির্দেশের অপেক্ষায়। লাল আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নীরবতা নেমে এল। কে যেন ক্ষণিকের জন্য বিরাট ব্লটিং পেপার দিয়ে হঠাৎ সব শব্দ শুষে নিল। তারপরই খট্ খট্ খট্ একনাগাড়ে শুরু হল।

আমি যে এয়ার রাইফেলটা ব্যবহার করি, তার ওজন পাঁচ কেজি। অত ওজনের রাইফেল ঠায় এক ঘণ্টা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। গত বছর সুনীল গাওস্কর আমাদের বাগবাজারের বাড়ি এসেছিলেন। আমার রাইফেল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিলেন, "বাপ্স রে, এত ওজনের একটা সরঞ্জাম নিয়ে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করো কী করে? আমি তো হেলমেটেই এখনও সড়গড় হতে পারলাম না।" আসলে এটা অভ্যাসের ব্যাপার। আমার তো রাইফেলটা এখন জলভাতের মতো হয়ে গেছে। এয়ার রাইফেল ইভেন্টটাও এমন, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি তাক্ ঠিক করলে, একচুলও সেখান থেকে নড়তে পারবে না। নড়লেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

কম্পিটিশন শুরু হবার আগে তাক্ ঠিক করার জন্য প্রত্যেককে দশটা করে গুলি দেওয়া হয়। সেদিন দু-তিনটে গুলি ছোঁড়ার পর বুঝতে পারলাম—সব ঠিক আছে। পিছনে ঘুরে ল্যানির দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। ওঁর প্রসন্ন মুখে একটাই ইঙ্গিত—"লড়ে যাও।" কথা বলার নিয়ম নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাইটারে—মানে যা দিয়ে টার্গেট দেখতে হয়, চোখ রাখলাম। মনে মনে দশ অবধি গুনলাম। দশ তো আমি পাচ্ছিই। কেননা আমিই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। ভাবতে ভাবতে সেই প্রথমবার ট্রিগারটা টিপলাম।

কম্পিটিশনের সময় কোনোদিন পয়েন্ট লেখার অভ্যাস আমার নেই। অনেককে দেখেছি পেন্সিল বা পেন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট গোনেন। আমার মত হচ্ছে, শুটিংয়ের সময় মাথায় সব সময় থাকবে বৃত্ত-আঁকা শুধু টার্গেট। তাই সেদিন একটার পর একটা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিন্তাতেও আনিনি—পয়েন্ট কত পাচ্ছি। আমার ডান পাশ দিয়ে টার্গেটগুলো পিছনে অবজার্ভারের কাছে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে পয়েন্ট দেখতে পারতাম। কিন্তু দেখিনি। সতেরো-আঠারোটা গুলি শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎই আমার মনে হল, কোনো গড়বড় হয়েছে। গড়ে নয় পয়েন্ট স্কোর করার কথা। বোধহয় হয়নি।

এ-কথা খেয়াল হতেই বুঝতে পারলাম, সাইটার ঠিকঠাক করার সময় কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। আমার কান্না পেয়ে গেল। এ আমি কী করলাম! যে ভুলটা সারা জীবনে কখনও করিনি, জীবনের সব থেকে বড় টুর্নামেন্টে সেই ভুলটাই করে বসলাম! আমাকে দ্রুত সামলে নিতে হবে। এখনও বাইশ-তেইশটা গুলি তো আছে। ধীরেসুস্থে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। আমার চোখ তখন টার্গেটে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। অ্যাটম বোমার ভয় দেখালেও আমার মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হত না। এইভাবে চল্লিশতম গুলিটা কখন যে খরচ হয়ে গিয়েছিল, জানতেই পারিনি। পিছনে হাত বাড়িয়ে অবজার্ভারকে ইঙ্গিত করছি—পরের টার্গেট বোর্ডে পাঠান। উনি পাঠাচ্ছেন না কেন? ফিরে দেখি মৃদু হেসে উনি বলছেন, "সরি, ডিয়ার, তোমার সব গুলি শেষ হয়ে গেছে।"

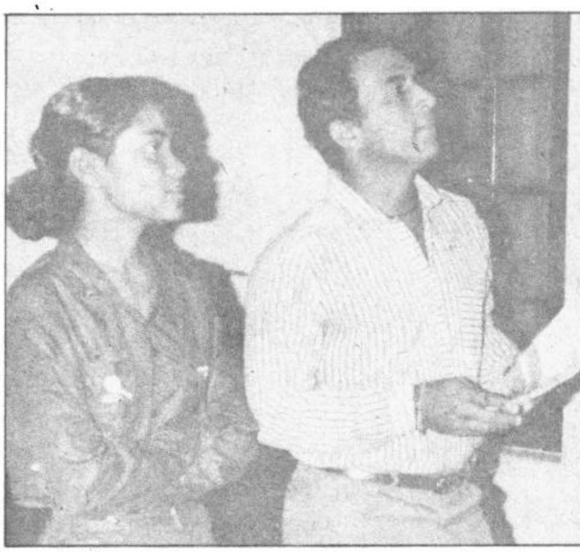

সোমা ; সুনীল গাওস্করের সঙ্গে

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবশ হয়ে গেল। রাইফেলটা ওখানে ফেলে রেখেই ল্যানির কাছে দৌড়ে গেলাম। দু-চোখ তখন আমার ঝাপসা হয়ে গেছে। উনি আমাকে কোলে বসালেন। কানে এল উনি বলছেন, "এত ভেঙে পড়ছ কেন? এ-রকম তো হতেই পারে। এই ব্যর্থতা তো আসবেই। বড় কম্পিটিশন কোনোদিন করোনি। সামান্য ভুল হতেই পারে। টেক ইট ইজি।"

তখনও অন্য শুটাররা গুলি ছুঁড়ছে। ল্যানি আমাকে লাঞ্চ রুমে টেনে নিয়ে গেলেন। আমি তখনও শুধু বলছি, "কেন আমি পারলাম না, তুমি আমাকে বলে দাও।" হঠাৎ দেখি আমার চারপাশে ভিড়। সব পরিচিত মুখ। রাজা ভালিন্দর সিং, তাঁর ছেলে রণধীর সিং, ভগীরথ সামই। রাজা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "তুমি ৩৭৬ পয়েন্ট স্কোর করেছ। ভারতের কোনো মেয়ে এই স্কোর আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। তুমি তো ভালই করেছ। তবে কাঁদছ কেন?" রণধীর বললেন, "আরে, এইমাত্র আমিও কম্পিটিশন করে এলাম। বিচ্ছিরি রেজাল্ট করেছি। তুই আমার থেকে অনেক ভাল পজিশন পেয়েছিস রে।"

ল্যানি আমাকে লাঞ্চ-রুমের একপাশে নিয়ে গেলেন। আমাকে শান্ত করার ওষুধ উনি জানতেন। ওখান থেকেই কাকে যেন টেলিফোন করলেন। তারপর রিসিভারটা আমাকে দিয়ে বললেন, "কথা বলো।" গলা শুনেই বুঝলাম, ও-প্রান্তে টেক্সাস থেকে কথা বলছেন ল্যানির বাবা গ্র্যাণ্ডপা। বললেন, "মনখারাপ কোরো না। ওলিম্পিকে অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। ভাল করে লাঞ্চ খেয়ে পরের কম্পিটিশনের জন্য তৈরি হও।" গ্র্যাণ্ডপা-র সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার পরই মনটা শান্ত হয়ে গেল। কেঁদে আর কী লাভ?

লাঞ্চ টেবলে বসে হ্যামবার্গার মুখে দিয়েছি, এমন সময় দেখি বাবা-মা আসছেন। মুহূর্তে গলার কাছে একদলা বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, "বাবা, তুমি কি কষ্ট পেয়েছ?"

আমার দু-চোখ বেয়ে তখন শ্রাবণের ধারা বইছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : জন ওপ্‌নশয়ের কাকার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন তার বাবার নামে এল খামের মধ্যে কমলালেবুর পাঁচটি বীজ। আর তার অল্পদিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ওপ্‌নশয়ের বাবার। সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল জন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সে হোমসের কাছে এসে সব জানায়। তারপর ···

॥ ৩ ॥

একটু থেমে থেকে ওপ্‌নশ ফের বলতে শুরু করল তার কথা। "এইরকম বলতে গেলে এক দুষ্টগ্রহের ফেরে আমি তো ওই সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলুম। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, সম্পত্তিটা আমি বিক্রি করে দিলুম না কেন। এর উত্তরে আমি বলব, আমাদের জীবনে এই যে একটা উট্‌কো অভিশাপ দেখা দিয়েছে, আমার বিশ্বাস, আমার কাকার জীবনের কোনো ঘটনার সঙ্গে এটা জড়িত। তাই, আমি যদি হর্শ্যাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই, তাহলেও এই অভিশাপের হাত থেকে আমি রেহাই পাব না।

"'৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমার বাবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তারপর থেকে দু'বছর আট মাস কেটে গেছে। আমি হর্শ্যামেই আছি। কিন্তু আর গোলমাল হয়নি। ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে, এত দিন যে অভিশাপ আমাদের বংশকে তাড়া করে ফিরছিল তা বোধহয় আমার কাকা আর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেছে। বলতে কী আমি বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলুম। আমার মনের ওপর যে ভয়ের ভাবটা চেপে বসেছিল সেটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু কালকেই টের পেয়েছি যে আমি এতদিন যা ভেবেছি তা কত ভুল! কাল সকালের ডাকে বাবার নামে যে রকম চিঠি এসেছিল, অবিকল সেই রকম একটা চিঠি আমার নামে এসেছে।" বলতে বলতে জন ওপ্‌নশ তার কোটের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো খাম বের করল। তারপর সে খামটা উপুড় করতেই টেবিলের ওপর পড়ল পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বীজ।

"এই সেই খাম। খামটা লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলের কোনো ডাকঘরে ফেলা হয়েছিল। আমার বাবাকে লেখা খামে যে কথা লেখা ছিল এই খামেও সেই একই কথা লেখা আছে। এই যে প্রথমে লেখা **K K K** আর তার পরের লাইনে লেখা 'সমস্ত কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবে।'"

"চিঠিটা পেয়ে আপনি কী করলেন?" হোম্‌স জিজ্ঞেস করলে।

"কিছুই করিনি।"

"কিছুই করেননি!"

দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে জন ওপ্‌নশ অত্যন্ত হতাশভাবে বলতে লাগল, "সত্যি কথা বলতে কী আমি একদম ভেঙে পড়েছি। আমার মনের অবস্থা হয়েছে অজগরের সামনে পড়া খরগোশের মতো। অজগরটা তাকে গিলে ফেলবে বুঝেও খরগোশটা যেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আমিও ঠিক সেই রকম হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার চারপাশে দুষ্টশক্তির যে জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসছে সেই জাল থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই নেই। কেউই বোধ হয় এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

"আরে ছিঃ ছিঃ," হোম্‌স বললে, "আপনার তো এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। এখনই তো আপনাকে আপনার শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করতে হবে। আপনাকে সবরকমভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে আপনি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পান। এখন এরকম চুপচাপ বসে হাহুতাশ করে লাভ নেই। বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পাবেন না। মনে সাহস এনে বিপদের মোকাবিলা করুন।"

"আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলেছি।"

"ও তাই নাকি? তা পুলিশ কী বললে?"

"আমার সব কথা শুনতে শুনতে ওরা যেভাবে মুখ ঘুরিয়ে মুচকে-মুচকে হাসছিল তাতে আমার মনে হল যে, পুলিশের বিশ্বাস হয়েছে যে, আমার সঙ্গে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করছে। আর আমার কাকা ও বাবার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। এই সব উড়োচিঠির সঙ্গে ওঁদের মৃত্যুর কোনো যোগাযোগই নেই।"

জনের কথা শুনে হোম্‌স তার বাঁ-হাতের তেলোয় ডান-হাতের মুঠো ঠুকতে ঠুকতে উত্তেজিতভাবে বললে, "ওহ্, এ রকম নির্বোধও যে কেউ হতে পারে তা বিশ্বাস করা শক্ত।"

"যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুলিশ থেকে আমার কাছে কাছে থাকার জন্যে একজন কনস্টেবলকে দিয়েছে।"

"সে কি আপনার সঙ্গে এখানে এসেছে?"

"না। তার দায়িত্ব হচ্ছে আমার বাড়িতে পাহারা দেওয়া।" জন বললে।

আমি লক্ষ করলুম যে, শার্লক হোম্‌সের চোখে-মুখে রাগ আর বিরক্তি দুই ফুটে উঠল।

তারপর সে জন ওপ্‌নশকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি আমার কাছে কী করতে এসেছেন? আর এলেনই যদি তবে এত দেরি করে এলেন কেন?"

"বিশ্বাস করুন আমি জানতুম না। আজকেই যখন মেজর পেণ্ডারগাস্টকে আমার এই বিপদের কথা বলছিলুম তখনই তিনি আমাকে আপনার কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"এই চিঠিটা আপনার পাবার পর দু-দুটো দিন কেটে গেছে। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আরও আগেই কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, আমাকে যা-যা বললেন এ-ছাড়া এই ব্যাপারের সঙ্গে যোগ

আছে এমন কোনো কিছু, তা সে যত সামান্য ঘটনা বা যত তুচ্ছ জিনিসই হোক, আপনি কি মনে করে বলতে পারেন ? বেশ ভাল করে ভেবে দেখুন। এমন কোনো কিছু যার থেকে এই রহস্যের সমাধানের কোনোরকম হদিস পাওয়া যেতে পারে।"

"হাঁ, মনে পড়েছে, একটা জিনিসের কথা বলতে ভুলে গেছি," বলে জন তার কোটের পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে একটা রঙ-উঠে-যাওয়া কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখলে। বোঝা যায় যে, এক সময় কাগজটার রঙ ছিল ফিকে নীল।

"আমার কাকা যেদিন তাঁর সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন সেই পোড়া কাগজের ছাইয়ের মধ্যে আমি দু-একটা এই রঙের কাগজের টুকরো দেখতে পেয়েছিলুম। তারপর আমি আর বাবা যেদিন চিলেকোঠা খুলি সেদিন এই কাগজটা মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখি। আমার তখনই মনে হয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি বাণ্ডিল করে আনবার সময় এই কাগজটা কোনোক্রমে কাকার হাত ফসকে পড়ে যায় বলে এটা আর সব কাগজের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারেনি। এই কাগজটাতে কমলালেবুর বীজের কথা ছাড়া এমন কিছু লেখা নেই যার থেকে আমাদের কোনো সাহায্য হতে পারে। আমার মনে হয় এটা একটা ডায়েরির ছেঁড়া পাতা। তবে হাতের লেখা যে আমার কাকার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

হোম্‌স টেবিল-ল্যাম্পটাকে ঘুরিয়ে কাগজটার ওপর ফেললে। আমরা দুজনে কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। কাগজটার একটা ধার এবড়ো-খেবড়োভাবে ছেঁড়া। বোঝা যায় যে, এটা কোনো ডায়েরি বা খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজটার ওপরে এক কোণে লেখা মার্চ '৬৯। তারপর এইরকম কতকগুলো হেঁয়ালির মতো লাইন ফর্দের মতো করে লেখা :

৪ তারিখ। হাডসন এসেছিল। সেই পুরনো প্ল্যাটফর্মে।

৭ তারিখ। ম্যাক্‌কলে, প্যারামোর আর সেন্ট অগাস্টাইনের সোয়েনের জন্যে কমলালেবুর বীজ ছাড়া হল।

৯ তারিখ। ম্যাক্‌কলে পরিষ্কার হয়ে গেল।

১০ তারিখ। জন সোয়েন পরিষ্কার হয়ে গেল।

১২ তারিখ। প্যারামোরের সঙ্গে মোলাকাত করা গেল। ফয়সালা হল।

কাগজটা ভাঁজ করে জনকে ফেরত দিয়ে শার্লক হোম্‌স বললে, "ঠিক আছে। এখন আর কোনো কারণেই একটি সেকেণ্ডও নষ্ট করা নয়। আপনি আমাকে যা বলেছেন সেটা নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সময়ও আর নেই। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান। আর আমি এখন যা বলে দেব তাই করুন।"

"বলুন আমাকে কী করতে হবে ?"

"এখন আপনাকে একটা কাজই করতে হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। কাজটা হল এই : এই যে কাগজটা এখন আমাদের দেখালেন সেটা আপনার কাকার যে হাত-বাক্সটার কথা বলছিলেন সেটার মধ্যে রেখে দেবেন আর

অন্য একটা কাগজে লিখবেন যে একমাত্র ওই কাগজটি ছাড়া আপনার কাকা তাঁর অন্যান্য সব কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন। কথাটা এমনভাবে লিখবেন যাতে তারা আপনার কথা সত্যি বলে মনে করে। তারপর আপনাকে লেখা চিঠিটায় যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে সেইমতো বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবেন। ...আমার কথা বুঝেছেন তো ?"

"হ্যাঁ।"

"আর একটা কথা। এখন আপনার বাবার কি কাকার খুনের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা তো দূরে থাক কল্পনাও করবেন না। অপরাধীকে আমরা আইনের ফাঁদে ধরে তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় ফন্দি করতে হবে। অথচ ওদের সুবিধে হচ্ছে যে ওদের সব মতলব অনেক আগে থেকেই ঠিক করাই আছে। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। তারপরের কাজ হল এই সমস্যার সমাধান করে অপরাধীরা যাতে শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করা।"

জন ওপ্‌নশ তার ওভারকোট পরতে পরতে বললে, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব মিঃ হোম্‌স তা জানি না। আপনি যেমনটি বললেন আমি ঠিক তেমনটিই করব। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি যে কতখানি ভরসা পেয়েছি তা বলতে পারি না।"

"বেশ। তবে এখন একদম সময় নষ্ট করবেন না। আপনার বিপদ যে সত্যি-সত্যি কী মারাত্মক সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ...ভাল কথা, আপনি ফিরবেন কীভাবে ?"

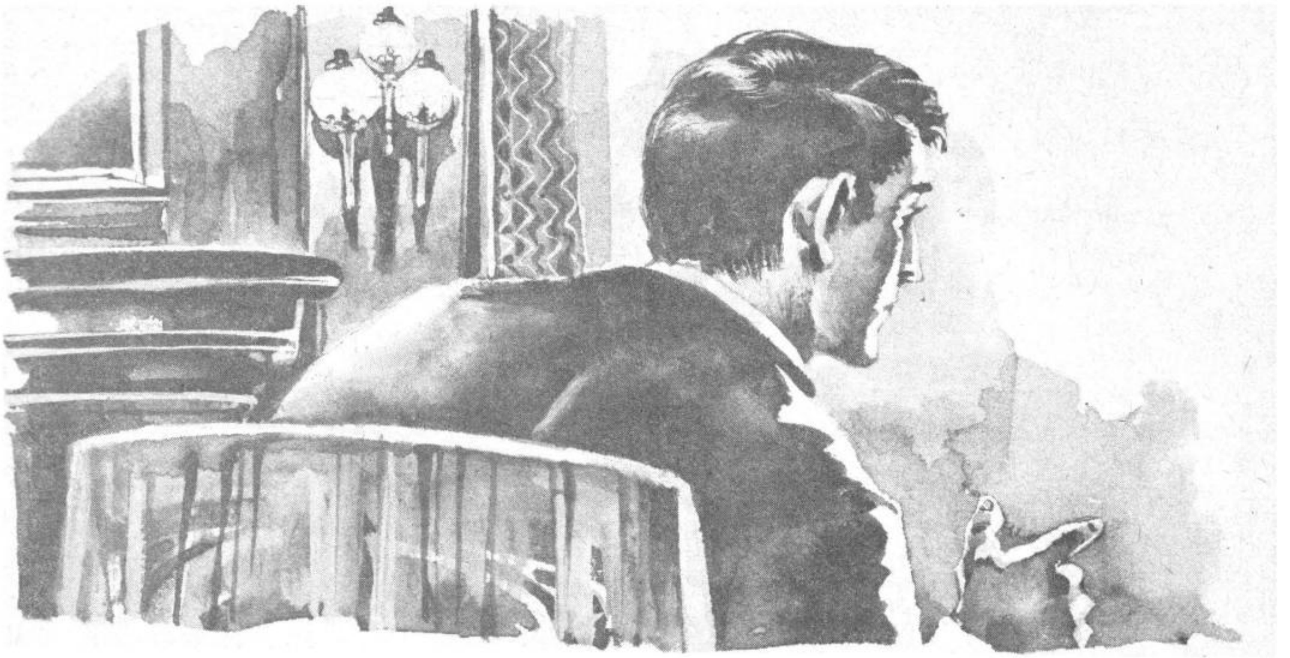

"আমি ওয়াটারলু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরব।"

"এখনও নটা বাজেনি। রাস্তায় এখনও লোকজন আছে। মনে হয় পথে আপনার কোনো আপদবিপদ হবে না। তবু সাবধানের মার নেই, খুব হুঁশিয়ার থাকবেন। চারদিকে নজর রাখবেন। বিপদকে কখনও অবহেলা করতে নেই।"

"আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।" ওপ্‌নশ মৃদু হেসে বললে।

"বাহ্‌, এটা ভাল করেছেন। আমি কাল থেকেই আপনার ব্যাপারে তদন্ত শুরু করব।"

"তাহলে তো কালই আপনার সঙ্গে হর্শ্যামে দেখা হবে।"

শার্লক হোম্‌স বললে, "না। এই রহস্যের মূল আছে লণ্ডন শহরেই। তাই লণ্ডনেই আমার কাজ শুরু হবে।"

"ঠিক আছে। তাহলে দু-একদিনের মধ্যে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব। ইতিমধ্যে ওই কাগজ আর বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপর রাখার ফলই বা কী হল আপনাকে জানাতে পারন। চিন্তা করবেন না, আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।"

জন ওপ্‌নশ চলে গেল। বাইরে তখনও ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জন আর বৃষ্টির একটানা ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে হল আমাদের হঠাৎ আসা এই মক্কেলের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনীর সঙ্গে বাইরে প্রকৃতির যে তাণ্ডবলীলা চলছে তার কোথায় যেন কিছুটা যোগ রয়েছে। দুটোর কোনোটাকেই আমাদের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মেলানো যায় না। দুটোই কেমন যেন অসম্ভব, অবাস্তব বলে মনে হয়।

ওপ্‌নশ চলে যাবার পর থেকে শার্লক হোম্‌স মাথা হেঁট করে চুপচাপ ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর হোম্‌স পাইপ ধরিয়ে আরামকেদারায় মাথা হেলিয়ে দেখতে লাগল কীরকম ভাবে নীল ধোঁয়ার চাকাগুলো একটার পর একটা ওপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শার্লক হোম্‌স বললে, "বুঝলে ওয়াটসন, আজ পর্যন্ত যত রহস্যজনক ব্যাপারের তদন্তের ভার আমাদের ওপর এসেছে তার কোনোটাই জন ওপ্‌নশের ব্যাপারটার মতো জটিল বা অদ্ভুত নয়।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলব যে 'সাইন অব ফোর'কে বাদ দিতে হবে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। তবে এ-কথাও ঠিক যে জন ওপ্‌নশের বিপদ কিন্তু শোলটোদের বিপদের চেয়ে ঢের বেশি সাংঘাতিক।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী ধরনের বিপদের মধ্যে ওপ্‌নশ ছেলেটি জড়িয়ে পড়েছে তা কি তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ?"

"সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।" হোম্‌স শান্ত গলায় উত্তর দিলে।

"বিপদটা কী ধরনের আর এই **K K K**-ই বা কী আর কেনই বা এই **K K K**, সে যেই বা যাই হোক এই লোকগুলিকে শিকারির মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেটা একটু খুলে বলবে কি?" আমি খানিকটা অনুনয়ের স্বরে হোম্‌সকে বললুম। সত্যি কথা বলতে কী এই কাহিনীর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।

আরামকেদারার হাতলে হাত রেখে দু'হাতের আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে হোম্‌স বলতে লাগল, "দ্যাখো ওয়াটসন, যে লোক বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে চায়, মানে যে যুক্তি দিয়ে সব জিনিস বুঝতে চায় সে যখন কোনো একটি ঘটনা কেন ঘটল তার কার্যকারণ বুঝতে পারে তখনই সে স্পষ্ট দেখতে পায় কী করে তার আগে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ঐ বিশেষ ঘটনাটি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এর পরে কী ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাও সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কুভিয়েরকে যে-কোনো জন্তুর ছোট্ট এক টুকরো হাড় দেখালে তিনি পরীক্ষা করে সেই জন্তুর চেহারার একটা নিখুঁত বিবরণ দিতে পারতেন। সেই একই রকম ভাবে যাঁর দেখবার চোখ আর বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা আছে তিনি যদি পরপর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মধ্যে খুব সামান্য কোনো কিছুর—তা

সে একটা ঘটনাই হোক বা কথাই হোক বা একটা আওয়াজই হোক—আসল মানেটা ধরতে পারেন তবে সেইটুকুর ওপর নির্ভর করে আগের ঘটনাগুলোর কার্যকারণ, সম্পর্ক তো বুঝতেই পারেন আর পরে কী ঘটতে চলেছে তাও অনুমান করতে পারেন। নির্ভুল বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির সাহায্যে আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কী আশ্চর্যরকম ফল পেতে পারি তা এখনও আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান করা হয়তো অনেক লোকের পক্ষে বিস্তর খাটাখাটনি করা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি, সেই রকম সমস্যার সমাধান কোথাও না গিয়ে স্রেফ ঘরে বসে করে ফেলা যায়।

"যে বিশ্লেষণী-শক্তির কথা আমি বলছি সেই শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাতে গেলে প্রথমে যা দরকার তা হল হাতের কাছে যে-সব তথ্য রয়েছে সেগুলোকে ঠিকমতো কাজে লাগাবার দক্ষতা। আর সেই দক্ষতা অর্জন করতে গেলে যেটা সবচেয়ে দরকারি সেটা হল অনেক বিষয়ের ওপর অগাধ জ্ঞান, যত বেশি সম্ভব বিষয়ের সম্বন্ধে গভীর পড়াশোনা। আর এ-কথাটা নিশ্চয়ই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, যদিও আমাদের দেশে এখন বিনা বেতনে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে আর এনসাইক্লোপিডিয়া ও সাধারণ জ্ঞানের বহু বই বাজারে বেরিয়েছে, তবুও নানা বিষয়ের ওপর রীতিমত দখল আছে এরকম পণ্ডিত কেউ নেই বললেই চলে। আমার কথা যদি বলো তবে বলতে পারি যে, যে-সব বিষয়ের জ্ঞান আমার নিজের কাজে লাগবে বা লাগতে পারে বলে মনে করি সেই-সেই বিষয়ের ওপর যতদূর পড়াশোনা করা যায় ততটা আমি করেছি। আমার মনে আছে যে, আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের অল্প কিছুদিন পরে তুমি আমার সম্বন্ধে বেশ একটা মজার হিসেব করেছিলে।"

আমি হেসে জবাব দিলুম, "হ্যাঁ। বলতে পারো সেটা তোমার সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট-কার্ড। দর্শনশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর রাজনীতিতে তোমার যা জ্ঞান তাতে আমি তোমাকে গোল্লা দিয়েছিলুম। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তোমার জ্ঞান চলনসই, ভূতত্ত্বে বিশেষ করে লণ্ডন শহরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিধির মধ্যে যে-সব জায়গা আছে সে-সব অঞ্চলের মাটির বিশেষত্ব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান অসাধারণ। রসায়নশাস্ত্রে তোমার জ্ঞান যাকে বলা যেতে পারে খাপছাড়া। শারীরবিদ্যায়ও তোমার জ্ঞান কোনো-কোনো বিষয়ে ভাল আবার কোনো-কোনো বিষয়ে খুব খারাপ। তবে খুন-রাহাজানি-জালিয়াতি বা যে-সব অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে তার খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্য তোমার নখদর্পণে। বেহালা বাজনায় তোমার হাত খুব ভাল। তুমি একজন ভাল মুষ্টিযোদ্ধা। দক্ষ অসিযোদ্ধা। আইনশাস্ত্রে বেশ ভাল দখল আছে। আর তুমি ভীষণ পাইপ খাও। ...যতদূর মনে পড়ছে তোমার চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই দিকগুলোই তখন আমার নজরে পড়েছিল।"

অল্প হেসে হোম্‌স বললে, "আমি তোমাকে তখনও যে কথা বলেছিলুম এখনও সেই কথা বলব। কথাটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক লোকেরই উচিত তার মস্তিষ্কের মধ্যে কেবলমাত্র সেই ধরনের তথ্যগুলি বেশ যত্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা দরকার যেগুলি তার কাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর যা কিছু তার নিজের কাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় সেগুলি সে গুদামজাত করে রাখবে তার লাইব্রেরিতে, যাতে প্রয়োজন হলেই তার যা জানবার সে জেনে নিতে পারে। এখন এই যে কেসটা আমাদের হাতে এসেছে সেটার ফয়সালা করবার জন্যে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল সমস্ত প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করা। তোমার চেয়ারের পাশের বইয়ের আলমারি থেকে আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়ার যে খণ্ডে '**K**' আছে সেটা বের করে দাও তো।'

বইটা বের করে হোম্‌সকে এগিয়ে দিলুম।

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দুই নভশ্চর

রঞ্জন ভাদুড়ী

একটি ছেলে মহাকাশে
আর-একজনা নীচে—
সয়ুজ-রকেট শূন্যে মেলায়
ধোঁয়া রইল পিছে।
মাটির সঙ্গে মহাকাশের
মেলবন্ধন দুটি—
নভশ্চরের নাম-তালিকায়
রাকেশ-রবীশ জুটি।
রাকেশ যদি শূন্যে ঘুড়ি
রবীশ তবে লাটাই—
একটি যদি না থাকে তো
আর-একটিও ছাঁটাই।
জলে স্থলে অন্তরিক্ষে
ট্রেনিং নিয়ে চাবুক,
আল্‌সে ভিতু অকর্মারা
তাঁদের কথা ভাবুক।
নামেও তাঁদের মিল রয়েছে,
মিল রয়েছে কাজে,
ভারত-মহাকাশের তারে
দুইটি নামই বাজে।

ছবি : অনুপ রায়

টিকিট—১০৲৭৲৫৲৩৲টাকা ● ১০৲ও ৭৲টাকার অগ্রিম টিকিট সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

উল্টাডাঙা গভর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড হায়ার সেকেণ্ডারি ইন্সটিটিউশন ফর গার্লর্স-এর প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

উল্টাডাঙা ভি· আই· পি· রোডের সংযোগস্থল থেকে কয়েক মিনিট হাঁটলেই এই বালিকা বিদ্যালয়টি। ১৯৬৩ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে। শ্রীমতী সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৭ সাল থেকে এই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। তাঁর শিক্ষিকাবৃত্তির অভিজ্ঞতা ছত্রিশ বছরের। প্রেসিডেন্সি থেকে বি· এসসি পাশ করেছেন। বাংলায় এম· এ·। লণ্ডনের লিডস্ ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে ডিপ্লোমা এবং নিউ কাস্‌ল্‌-এ এডুকেশনে ডিপ্লোমা নিয়েছেন। প্রতি বছর এই স্কুল থেকে যত ছাত্রী পরীক্ষা দেয়, প্রায় সকলেই কৃতকার্য হয়। যেমন এ বছরে মোট পরীক্ষার্থিনী ছিল ৪২ জন। ১০ জন প্রথম বিভাগে, ৩০ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে।

কী ভাবে বাংলা পড়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানা শিক্ষিকা বললেন, "ভাষায় দখল থাকলে ভাল উত্তর লিখতে পারা যায়। ভাষায় অবশ্যই সাধু-চলিতের মিশ্রণ বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যাকরণের উপর জোর দিতে হবে।"

ইংরেজি সম্পর্কে তিনি বললেন, "কথোপকথনের ভিত্তিতে ইংরেজি শিখলে ভাল হয়। টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। নোটবই পড়ার ব্যাপারে আমি ছাত্রীদের উৎসাহী করতে রাজি নই।"

অঙ্ক প্রসঙ্গে বললেন, "যিনি অঙ্ক শেখাবেন তিনি ক্লাসে কয়েকটি অঙ্ক দৃষ্টান্ত হিসেবে করে দেবেন। তারপর সেই দৃষ্টান্ত ছাত্রীরা অনুসরণ করবে। চর্চা করবে। প্র্যাকটিক্যাল সেন্স দিয়ে অঙ্কগুলি করতে হবে।"

ইতিহাস পড়ার প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "ইতিহাসের সাল-তারিখ অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নিছক রাজারাজড়ার জীবনী শুধু নয়, সেই সঙ্গে

সভ্যতার বিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে পড়া চাই।"

ভূগোলের ক্ষেত্রে তো ম্যাপ অপরিহার্য। সেই সঙ্গে গ্লোব মডেল এবং চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভূগোল সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের একটিই আতঙ্ক। দেশ ও নদনদীর এত নাম কেমন করে মনে রাখবে ? এই পদ্ধতি সেই আতঙ্ক দূর করবে।"

এবার তাঁকে *বিজ্ঞান প্রসঙ্গে* প্রশ্ন করলাম। উনি বললেন, "শুধু মুখস্থ করলেই চলবে না। টু দা পয়েণ্ট উত্তর লিখতে হবে। ছবি আঁকা চাই। লাইফ সায়েন্সে মডেল চার্টের সাহায্যে সমস্ত জিনিসটাই যদি ল্যাবরেটারিতে দেখানো যায় তবে সবচেয়ে ভাল। ফিজিক্যাল সায়েন্সে একাধিক বই পড়তে হবে। 'লাইট'-এর রে এঁকে ডিরেক্‌শন না দেওয়াটা বড় ভুল। ভাষা যেন সরাসরি ভাব প্রকাশের বাহক হয়।"

শ্রীমতী সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "আমাদের স্কুলে *কর্মশিক্ষায়* হাতের কাজ করানো হয়। মনে হয় এতে ছাত্রীদের সুপ্ত শিল্পবোধ জেগে ওঠে। তাছাড়া এতে কাজের আনন্দটা থাকে। সৃষ্টির আনন্দও বটে।"

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল শম্পা ঠাকুর। বাবা শ্রীকালিকাপ্রসাদ ঠাকুর পি এন· টি'র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। মা শ্রীমতী কুহু ঠাকুর। এঁরা বাড়িতে কন্যার পড়াশোনা দেখেন। শম্পারা থাকে সল্ট লেকে। পড়াশোনার ব্যাপারে শম্পা বলল, "টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। প্রথমে ইংরেজি, বাংলার পিসগুলি পড়ে নিয়ে টেস্ট-পেপার্স থেকে প্রশ্ন নিয়ে উত্তর লিখি। বাড়িতে মা ও বাবা এবং স্কুলে দিদিরা তা সংশোধন করে দেন। বাংলায় বামনদেব চক্রবর্তীর ব্যাকরণ, লাইফ সায়েন্সে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী ও কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডুর বই। ফিজিক্যাল সায়েন্সে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সমর গুহ ও ম্যাকমিলান-এর বই পড়ি। ইতিহাসে কিরণ চৌধুরী, প্রভাতাংশু মাইতির ইতিহাস। ভূগোলে 'ভারত ও বসুধা' এবং লোকেশ চক্রবর্তীর বই।"

শম্পা কবিতা লেখে। শম্পা ছবিও আঁকে। সে পাক্ষিক আনন্দমেলার ভক্ত পাঠিকা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পত্রিকা তার পড়া চাই। খেলাধুলোর বিভাগটি তার খুবই প্রিয়।

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

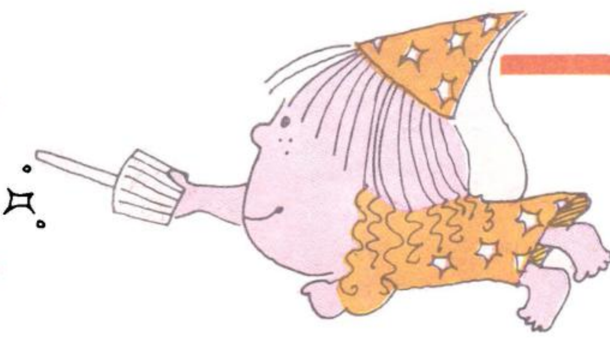

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা—হাতি—বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

কিটি বেড়াল কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী" পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

কিটি বেড়াল কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

সহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্ট্ পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ না (A)

ফেভিকল এম-আর ®

সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর ফেভিকল ছাপ, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

.OBM-4103 BEN

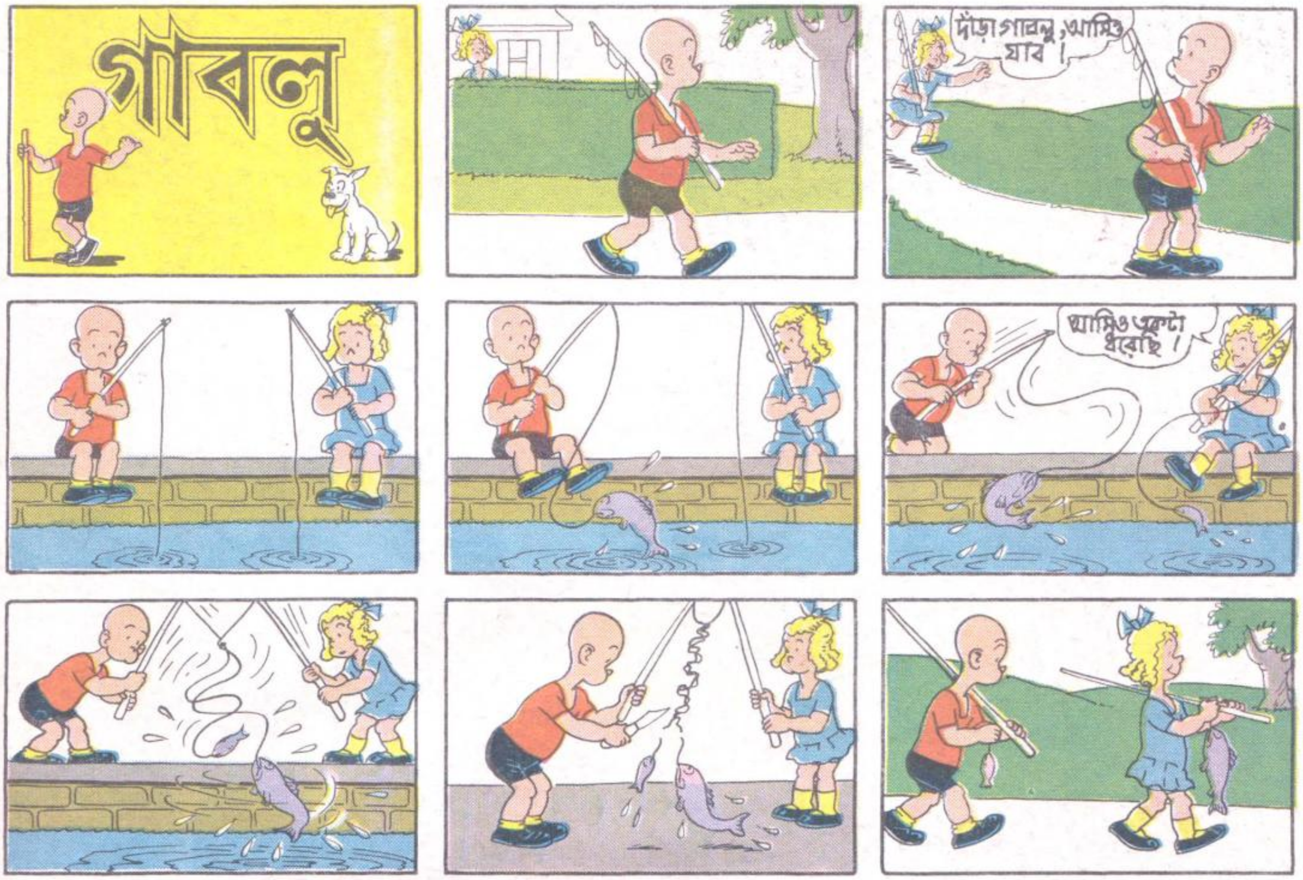
গাবলু
দাঁড়া গাবলু, আমিও
যাব!
আমিও একটা
ধরেছি!

গাবলু
গুন্ডাটাকে ভয়
পাস কেন?
তোর কি একটুও
সাহস নেই?
ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়
ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়
হয়েছে
ঘড় ঘড় ঘড়
বাস রে!

ফ্ল্যাশ গর্ডন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

প্রথম খেলা নিরুত্তেজ

রাজা গুপ্ত

তিন নির্বাচকের ছটা চোখ মাঠে ছায়ার মতো সর্বদা অনুসরণ করছে, এই ভয়ঙ্কর সত্যি কথাটা জানা ছিল বলেই বোর্ড প্রেসিডেন্ট দলের উঠতি তরুণরা নিষ্প্রাণ পিচ আর ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানের বোলিংয়ের বিরুদ্ধেও কিছুতেই সহজ হয়ে উঠতে পারল না। অথচ ভারত সফরের উদ্বোধনী ম্যাচে ইংরেজ অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার টসে জিতেও ব্যাট করার সুযোগ দিয়েছিলেন সভাপতি একাদশকেই।

একথা কোনো সময়েই বলা যাবে না যে, জামাইকাজাত নর্মান কাওয়ানস্, পল্ অ্যালট কিংবা বাঁ-হাতি এলিসনের স্পিড ও সুইংয়ের কারিকুরি কিংবা স্পিনার এডমণ্ডস্ ও মার্কসের জাদু-প্রভাব মোহাবিষ্ট রেখেছিল ব্যাটসম্যানদের। তবু বোর্ড সভাপতি একাদশের পক্ষে সারাদিনে খুট-খুট করে ১৮৯ রানের বেশি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কারণ একটাই। টেস্ট দলে স্থানলাভের আশায় তরুণ ব্যাটসম্যানরা একটু বেশি রকমেরই সতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন অশোক মালহোত্রা। প্রথম দিনেই ৯৪ রানে অপরাজিত থেকে তিনি যে ব্যাপারটি সকলকেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, বলা বাহুল্য, সেটি তাঁর হাত। পাকিস্তান সফরে আশ্চর্য কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই উপেক্ষার জ্বালা মেটালেন মালহোত্রা প্রথম সুযোগেই। দ্বিতীয় দিন তিনি প্রত্যাশিত শতরান পেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড সভাপতি একাদশ পাঁচ উইকেটে ১৯৮ রানে ইনিংস ছেড়ে দেয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে ইংল্যাণ্ড দল ভারত সফরে এসেও শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল ম্যাচ প্র্যাকটিস সেরে নেবার প্রয়োজনে। ব্যাটসম্যানরা যে মোটামুটি ভাল ফর্মে আছেন সেটা ইংল্যাণ্ডের খেলায় বোঝা গেছে। ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে পেস-স্পিন কোনো বিভাগেই কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারেননি সভাপতি একাদশের বোলাররা। বোম্বাইয়ের রাজু কুলকার্নি বিশেষ মহলে সস্নেহে পিঠচাপড়ানি লাভ করলেও কার্যক্ষেত্রে এখনও তেমন বড়সড় কাণ্ড ঘটাতে পারেননি। বোলিং এণ্ডে মার্শাল, গারনার, হোল্ডিং না থাকায় নিরুদ্বিগ্ন ইংরেজরা রণধীর-কুলকার্নি নামক মধ্যগতির জুটিকে অনায়াসে খেলেছে। বাঁ-হাতি স্পিনার রঘুরাম ভাট কিংবা ডানহাতি অফস্পিনার অশোক প্যাটেলের বোলিংয়ে বিপক্ষকে ফুঁড়ে ফেলার শক্তি না থাকায় ইংল্যাণ্ড ব্যাটিং অনুশীলনে মন দেয়। এবং তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পঞ্চাশ মিনিট পরে ৮ উইকেটে ৪৪৪ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। এলিসন এবং মার্কস ভাল রান পেলেন। তবে ব্যাটিং-লাবণ্যে মুগ্ধ করেন গাওয়ার। এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম সেরা স্টাইলিশ ব্যাটসম্যানটি যে পুরো সিরিজ ধরে ভারতীয় বোলারদের দুঃস্বপ্নের কারণ হবেন, প্রথম ম্যাচেই সেটার প্রমাণ রইল। বোর্ড-সভাপতি একাদশের পক্ষে আজাহারুদ্দিন দ্বিতীয় দফায় অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংস খেলে নির্বাচকদের নোটবুকে 'সম্ভাব্য' তালিকায় উঠলেন।

এই ম্যাচে বাংলার যে ছেলেটি খেলবে খেলবে করেও শেষ পর্যন্ত দল থেকে বাদ পড়ে গেল সেই অভীক মিত্র আগামী বহুদিন নিরুত্তেজ বোলিং আর নিষ্প্রাণ পিচের কথা ভেবে আপসোস করবে। জানি না, উপেক্ষিত পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটারদের এই ধরনের অপেক্ষায় আর কতদিন থাকতে হবে?

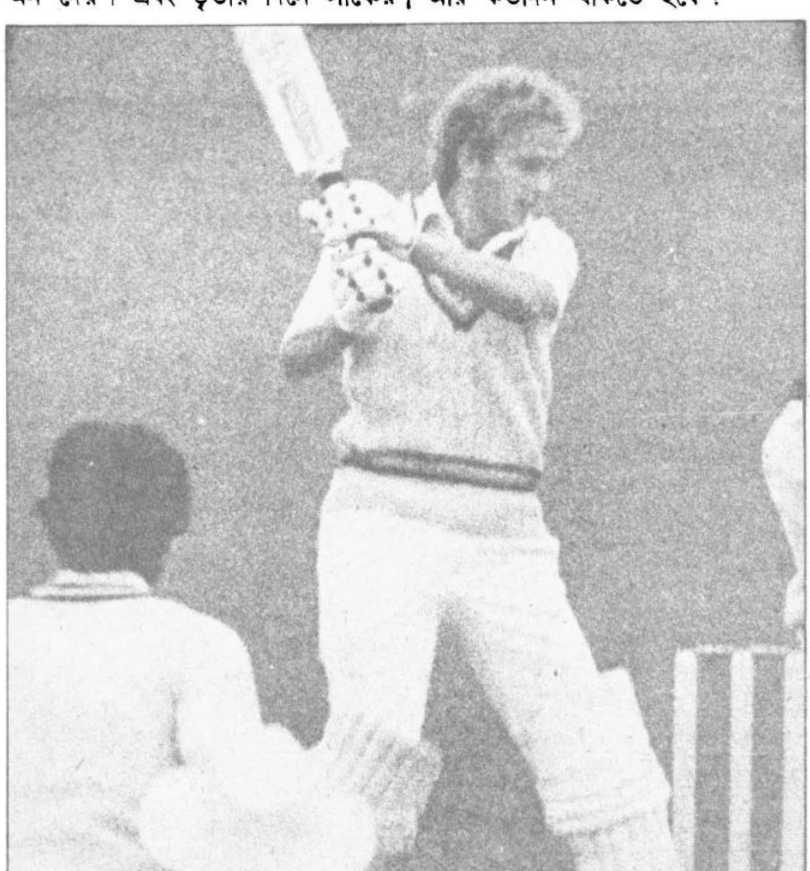

ডেভিড গাওয়ার (বোলারদের চিন্তার কারণ হতে পারেন)

এক ডজন ডুরাণ্ড

নৃপতি চৌধুরী

অনেকেই বলেছিলেন নিয়মিত ছ-জন ফুটবলার ক্যাম্পে চলে যাওয়ায় মোহনবাগান শিবির এখন অন্ধকার। এই টিম নিয়ে আর যাই হোক ট্রফি জেতা অসম্ভব। কিন্তু কোচ পি· কে· ছিলেন। আর ছিলেন এগারোজন ফুটবলার, ক্লাবের সম্মানরক্ষার অঙ্গীকারে যাঁরা ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। ইস্টবেঙ্গলের মতো একটি 'টাফ' টিমকেও যে ভেঙে দেওয়া সম্ভব দিল্লিতে সেই সত্যটাই প্রতিষ্ঠিত হল। এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত এই বছরে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল চারবার। ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল দু-বার, মোহনবাগান একবার। সুতরাং মোহনবাগানের এবারের জয় ফলাফলকে আবার বেঁধে ফেলল এক বিন্দুতে।

ইস্টবেঙ্গল যেভাবে - ভাগ্যের সহায়তায় প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফাইনালে পৌঁছেছিল তাতে এই আশঙ্কা

প্রতাপ (গোল বাঁচিয়েছেন)

গোড়াতেই ছিল যে, এইভাবে শেষরক্ষা হবে কি? কিন্তু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ মানেই অনিশ্চয়তা। সুতরাং ডুরাণ্ড দখলের প্রশ্নে কোন্ দল সাফল্য পাবে এটা ঠিক করা কঠিন ছিল।

এই ম্যাচে দু-জনকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমজন বিদেশ বসু, দ্বিতীয় নামটি প্রতাপ ঘোষ। বিদেশ অনেকদিন পরে তাঁর অতীতদিনের সজীবতা ফিরে পেয়েছিলেন। একজন গতিসম্পন্ন উইঙ্গার শুধুমাত্র দৌড়কে মূলধন করেই যে কতবড় কাণ্ড ঘটাতে পারেন বিদেশ তা আরেকবার দেখালেন। মনোরঞ্জনের পায়ের ডগা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বিদেশ যে দৌড় মেরেছিলেন, ভারতের সেরা স্প্রিণ্টারের কাছেও সেই দৌড় ছিল ঈর্ষণীয়। শুধু দৌড়ই নয়, বলাই আর মনোরঞ্জনের পদশব্দে বিভ্রান্ত না হয়ে, এগিয়ে-আসা ভাস্কর গাঙ্গুলির মাথা টপকে বাঁ পায়ে নেটে বল রাখা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিদেশ যন্ত্রের মতো নিখুঁত দক্ষতায় কাজ করে গেছেন।

গোলের খোঁচা খেয়ে ইস্টবেঙ্গল অস্থির করে তোলে মোহনবাগানকে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের স্ট্র্যাটেজিটাই ছিল গলদ-ভরা। দুই প্রান্ত থেকে বাতাসে বল ভাসিয়ে রাখার যে কৌশল ইস্টবেঙ্গল নিয়েছিল মোহনবাগানের দুই স্টপার সমর-সত্যজিতের মাথায় তা একের পর এক প্রতিহত হয়েছে। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণগোপাল কিন্তু বেশ কয়েকবার ওপরের বল দখলের লড়াইতে বিব্রত করেছেন 'হেড'-মাস্টার মনোরঞ্জনকে। তবে একথা মানতেই হবে যে, পরাজিত দলে মনোরঞ্জনই ছিলেন সেই খুঁটি, ডিপ ডিফেন্স যাঁর নেতৃত্বে জমাটবদ্ধ ছিল প্রায় সর্বক্ষণই। বলাই মুখার্জি আর সমীর চক্রবর্তী ওভার-ল্যাপে উঠে বেশ কিছু বল বাড়িয়েও ফল পাননি দেবাশিস, গুরুং এবং কার্তিকের ব্যর্থতায়।

দ্বিতীয়ার্ধে মনোরঞ্জনের লব থেকে দেবাশিস চকিতে হেড নিয়েছিলেন। বল যখন পোস্টের ধার ঘেঁষে গোলে

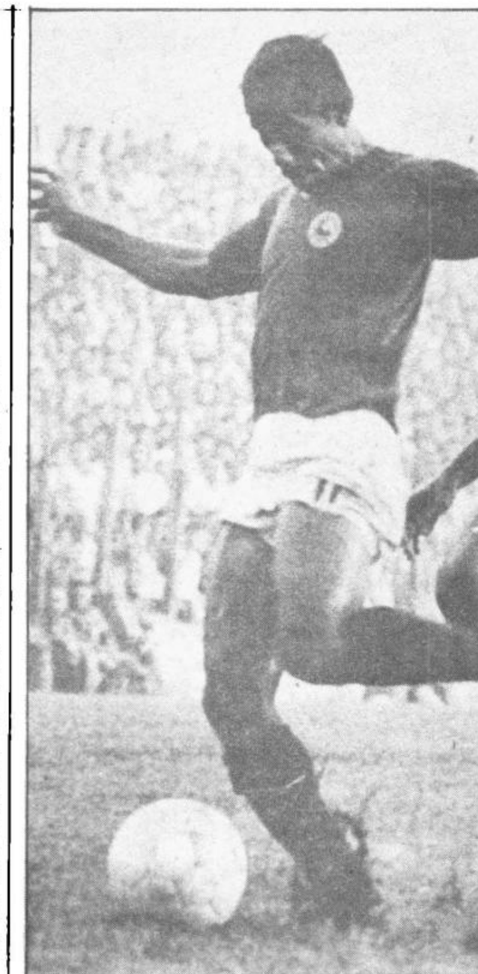

বিদেশ (গোল দিয়েছেন)

ঢুকছে তখন হঠাৎই ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক এবং খেলোয়াড়রা সবিস্ময়ে লক্ষ করেন গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষের হাত আশ্চর্যভাবে লম্বা হতে হতে কীভাবে যেন পৌঁছে গেল বলের কাছে। এবং শেষ মুহূর্তে সেই 'ইলাস্টিক' হাতটাই টোকা দিয়ে পালটে দিল বলের গতি। শুধু এইটাই নয়, এই ম্যাচের দর্শকরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন প্রতাপ নামের প্রহরীটি বারের তলায় ছিলেন সিকিওরিটি গার্ডের মতোই সতর্ক। একেবারে শেষ মুহূর্তে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের ক্লান্তির সুযোগে একেবারে ফাঁকায় বল পান কার্তিক শেঠ। সেই কার্তিক, শিল্ডে মোহনবাগানকে একমাত্র গোলে বধ করেছিলেন যিনি। এবার কিন্তু শেষ মিনিটের শেষ আক্রমণটি আটকে গেল প্রতাপ নামের ছাঁক্‌নিতে।

মোহনবাগান এবার নিয়ে ডুরাণ্ড জিতল বারোবার।

বিধ্বংসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

অশোক রায়

'সমরাস্ত্র সম্ভারে কে বেশি শক্তিমান, রাশিয়া না আমেরিকা', এই প্রশ্নে আপোসহীন বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু ক্লাইভ লয়েডের অস্ত্রশালার শক্তি সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ভারত ও ইংল্যাণ্ড বুঝে গেছে, নারকেলগাছের পাতায়-পাতায় বাতাসের শনশন শব্দ আর বালুতটে আছড়ে পড়া অশান্ত সাগর-গর্জনে যে-দ্বীপমালা মুখর, সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট শুধু সঙ্গীতময় নয়, সংহারকও বটে। অবশ্য শুধু ভারত, ইংল্যাণ্ডই বা বলি কেন, এখন গোটা পৃথিবীই একবাক্যে মেনে নিয়েছে, ক্রিকেট-মাঠে বিধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত সর্বশক্তিমান দেশটির নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। রিটায়ার করার আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দলপতি ক্লাইভ লয়েড সম্ভবত বুঝিয়ে দিতে পারলেন যে, তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা কষার মতো প্রতিপক্ষ আর কেউ নেই।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজ পৃথিবীর ফাস্টেস্ট উইকেট হিসেবে স্বীকৃত পার্থে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন একটিই কারণে। হিউজ ভেবেছিলেন, বৃষ্টিভেজা উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলারদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে চার পেসার নিয়ে আক্রমণ করাটাই সুবিধেজনক। মাত্র ১০৪ রানে রিচার্ডস, লয়েড, গ্রিনিজ, হেনস সহ অর্ধেক ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে তাঁবুতে ফেরত পাঠিয়ে হিউজ যখন কিস্তিমাতের আনন্দে বেজায় খুশি, ঠিক তখনই স্বপ্নভঙ্গের কারণ ঘটালেন ল্যারি গোমস আর জেফ দুজোঁ। উইকেটে অনড় হয়ে দাঁড়ানোর ফলে স্কোরবোর্ডে 'ফল-অব-উইকেটস' লাগাবার দায়িত্বে থাকা লোকটি কর্মহীন হয়ে পড়ল। দুজনেই দুটি সেঞ্চুরি করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শঙ্কা থেকে স্বস্তিতে ফেরে। বছর দুয়েক টেস্ট থেকে সরে থাকার পর দলে ফিরে টেরি অলডারম্যান ছটি উইকেট নিলেন নিজের মাঠে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই ম্যাচে ওইটাই একমাত্র স্বস্তিদায়ক ব্যাপার।

৪১৬ রানের পাহাড় সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনাররা ব্যাট করতে নামলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল, গারনার, হোল্ডিংয়ের সঙ্গে চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল লয়েডের। 'প্লে' শব্দটি আম্পায়ারের মুখ থেকে বেরুনো মাত্র তিনটি কালো ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ট্রেলিয়ানদের ওপর। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে এমন ঝড় আগে কখনও ওঠেনি। দেখতে দেখতে গোটা দল অল আউট হয়ে গেল মাত্র ৭৬ রানে। লয়েড তাঁর তিন পেসারকে বলেছিলেন ধরে আনতে, ওঁরা পিছমোড়া করে বেঁধে আনলেন অস্ট্রেলিয়ানদের। ছটি অস্ট্রেলীয় বধের কৃতিত্ব নিয়ে হোল্ডিং এসে দাঁড়ালেন লয়েডের কাছে শুধু 'ওয়েল ডান' কথাটা ক্যাপ্টেনের মুখে শুনবেন বলে। লয়েডের মুখে গম্ভীর উচ্চারণে এই রকম একটি-দুটি শব্দ গোটা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটাকেই যেন ব্যাটারি চার্জ করে দেয়।

৩৪০ রানে পিছিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া ফলো-অনের কবলে পড়ে। এবং তৃতীয় দিনের শেষে পাঁচ উইকেটে ১৫৮ রান তোলায় ম্যাচের ভবিষ্যৎ তখনই মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় হোল্ডিংয়ের বিশ্রাম। দায়িত্ব নিলেন মার্শাল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গতির ঝড়ে উপড়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়াকে। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ইনিংস শেষ করল ২২৮ রানে। ইনিংস ও ১১২ রানে জিতল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। সেই সঙ্গে একটা বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেলল। এতদিন একটানা আটটি জয়ের রেকর্ড ছিল ওয়ারউইক আর্মস্ট্রংয়ের অস্ট্রেলিয়ার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতল একটানা নটিতে।

ক'দিন আগে ইংল্যাণ্ড ০-৫ মার্জিনে চূর্ণ হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যেও কি সেই একই ফল অপেক্ষা করছে?

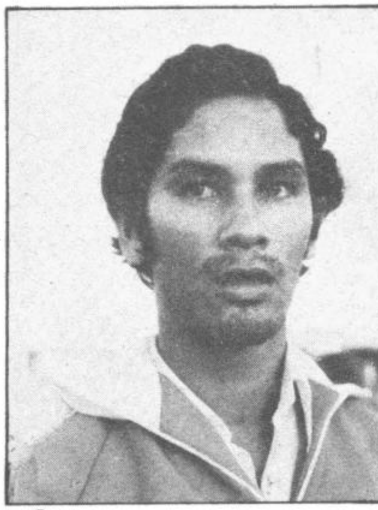

ল্যারি গোমস

মাইকেল হোল্ডিং

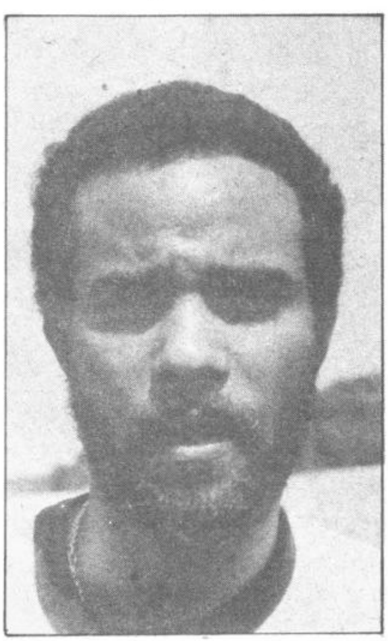

জেফ দুজোঁ

হাজার টেস্টের মেলায়

সম্রাট রায়

টেস্ট ক্রিকেটের একশো বছর পূর্ণ হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। ১৯৮৪ সালে টেস্ট ক্রিকেট পৌঁছল আরেকটি মাইল-স্টোনে। ২৫ নভেম্বর পাকিস্তান-নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্টটিই ক্রিকেট ইতিহাসের হাজারতম ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত হল। এই লেখা তোমরা যখন পড়বে, তখন অবশ্য সহস্রতম টেস্ট ম্যাচের ফলাফলও তোমাদের জানা হয়ে গেছে।

প্রত্যেকটা টেস্ট ম্যাচই শুধু ব্যাট-বলের যুদ্ধ নয়, দু' দেশের কাছে সম্মান-রক্ষার লড়াইও। একটু ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে হাজার টেস্টের প্রত্যেকটা ম্যাচই ঘটনায়, চরিত্রে এবং প্রকাশে অন্যটি থেকে আলাদা। আজ চলো মেলবোর্ন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার, কলকাতা থেকে করাচি, অকল্যাণ্ড থেকে অ্যান্টিগুয়ার মাঠে মাঠে ছড়িয়ে-থাকা হাজার টেস্টের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে একবার উঁকি দিয়ে দেখা যাক।

টেস্ট ক্রিকেট প্রথম শুরু হয়েছিল মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ সেই উদ্বোধনী টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৪৫ রানে। এরপরে একে একে টেস্ট ক্রিকেটে যোগ দেয় দক্ষিণ

মহম্মদ নিসার

আফ্রিকা (১৮৮৯ সাল), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (১৯২৮), নিউজিল্যাণ্ড (১৯৩০), ভারত (১৯৩২), পাকিস্তান (১৯৫২), শ্রীলঙ্কা (১৯৮২)। পাকিস্তান বাদে সব দেশই টেস্ট ক্রিকেট শুরু করেছে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের শুরু অবশ্য ভারতের বিপক্ষে। একটা মজার ব্যাপার, সব দেশই প্রথম টেস্টে হারের তেতো বড়িটি গিলতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম অস্ট্রেলিয়া।

ভারত ১৯৩২ সালে লর্ডসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামে সি· কে· নাইডুর নেতৃত্বে। ভারতের সংগ্রহে প্রথম রানটি জমা দেন জে জি নাভ্‌লে এবং প্রথম উইকেটটি সংগ্রহ করেন দীর্ঘদেহী ফাস্টবোলার মহম্মদ নিসার। ভারতের পক্ষে প্রথম 'টেস্ট ক্যাপ' লাভ করেন সি· কে· নাইডু। এবং ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ভারতের পক্ষে ১৬৭তম ক্রিকেটার হিসেবে অবতীর্ণ হন চেতন শর্মা। তোমাদের জানতে ইচ্ছে হতে পারে বলেই জানিয়ে রাখি, সুনীল গাওস্কর ভারতের ১২৮তম ক্রিকেটার।

ভারত এ পর্যন্ত সবসমেত টেস্ট খেলেছে ২২১টি। এর মধ্যে জিতেছে ৩৫টি, হেরেছে ৮০টি এবং ড্র করেছে ১০৬টি (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষে)। টেস্টে ভারতের প্রথম জয় আসে বিজয় হাজারের নেতৃত্বে। ১৯৫১-৫২ সিরিজে মাদ্রাজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সেই প্রথম টেস্ট জয়ের পেছনে ছিল বাঁ-হাতি স্পিনার ভিনু মাঁকড়ের অসাধারণ বোলিং-নৈপুণ্য। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম জয় আসে কানপুরে ১৯৫৯ সালে অফ-স্পিনার জেসু প্যাটেলের মারাত্মক বোলিংয়ে। শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডজের বিরুদ্ধে অবশ্য জয় পেতে আমাদের ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান (৮৫১৪), সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি (৩০টি), সর্বোচ্চ রান (২৩৬ নট আউট), সর্বাধিক ক্যাচের (৮৯টি) রেকর্ড একা দখলে রেখেছেন সুনীল গাওস্কর। এর মধ্যে প্রথম দুটি বিশ্বরেকর্ড। বোলিংয়ে সর্বাধিক উইকেট হয়েছে বাঁ-হাতি স্পিনার বিষেণ সিং বেদির দখলে (২৬৬টি উইকেট)। উইকেট সংগ্রহের বিশ্বরেকর্ডটি (৩৫৫টি) আছে অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলির দখলে।

সমস্ত টেস্ট প্লেয়িং দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছে ইংল্যাণ্ড, ৬০৬টি। ৪৪৪টি টেস্ট খেলার কৃতিত্ব নিয়ে অস্ট্রেলিয়া রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। এবার বোম্বাইয়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতের প্রথম ম্যাচটি হবে ক্রিকেটের ১০০১-তম টেস্ট। সহস্রতম টেস্টটি এখানে হল না। তবে পরের হাজারের শুরুটা হচ্ছে এখানেই, সেও কম কথা নয়।

সি· কে· নাইডু

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি - ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয় আর তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তার জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

ব্রণকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের ছাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে ব্রণ হয় বা তা ছড়িয়ে পড়ে, তার এটি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে, ব্রণ শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ভ্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3556 BEN

ANANDAMELA 12 DECEMBER 1984 REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS (C)/731